ইতিহাস পরিচয়



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of History for Class VI Vide TB No VI/H/79/119 dated 5. 12. 79

ইতিহাস পরিচয়

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীসুকুমার দাস এম. এ., এম-এস-সি., বি টি.
কেরিয়ার মাস্টার ট্রেইণ্ড, ডি. ই. এল. টি, ডিপ্লোমা ইন্
এডুকেশনাল এড্‌মিনিস্ট্রেশন (এডিনবরা)।

ও

হরেন্দ্র চন্দ্র আচার্য এম এ., বি টি.

বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির

৭-বি কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

এস. দাস
বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির
৭-বি কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৭৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৮৩

মূল্য : নয় টাকা আটচল্লিশ পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীমলয় ভট্টাচার্য
নীলাচল প্রেস
৯ নং এ্যান্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শকেরা অনেক সময় বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের সময় এবং সুযোগ পান না। যাহারা সময় করিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান তাহারা আবার বিদ্যালয়ে গিয়া সব সময় ভাল পাঠ্য পুস্তকের সন্ধান পান না। বস্তুতপক্ষে সেই বিদ্যালয় পরিদর্শক কতিপয় বন্ধুদের অনুপ্রেরণাতেই ষষ্ঠ শ্রেণীর "ইতিহাস পরিচয়" বইখানি লিখিয়াছি।

বইটি রচনায় চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই। ভালো লাইনো টাইপ প্রেসে অত্যন্ত যত্নের সহিত এই বইটি ছাপাইলাম। বইটি সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে কিনা জানি না। তবে বইটি পড়িলে ছাত্র-ছাত্রীরা যে উপকৃত হইবে সেই দাবী আমি করিতে পারি। বইখানির উৎকর্ষ সাধনের জন্য সহৃদয় শিক্ষকবন্ধুগণ যদি পরামর্শ দেন তবে খুবই বাধিত হইব।

যাহাদের সাহায্য, অনুপ্রেরণায় এবং সক্রিয় সহযোগিতায় এই পুস্তকখানি প্রকাশ করা হইল, সেই পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির সভ্যদের প্রতি আমার এই বইখানি উৎসর্গ করিলাম।

৭ বি, কলেজ রো — ইতি—
কলিকাতা-৯ — বিনীত
১৬. ১. ৮৪ — শ্রীসুকুমার দাস

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ইতিহাস কেন পড়া উচিত

অতীত দিনের ঘটনা আর কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের ইতিহাস। তোমরা নিচের শ্রেণীতে পড়েছ ইতিহাসের অনেক গল্প। শুধু যে ইতিহাসই পড়েছ তা নয়। যে-সব যুগের কথা ইতিহাসে লেখা আছে তার আগের কথাও পড়তে হয়েছে তোমাদের। এই যেমন মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার কথা। তারও আগের মানুষ কী করে পৃথিবীতে এল—তাও তোমরা পড়েছ। আর সেজন্যই জানতে ইচ্ছে করবে অতীতকাল থেকে মানুষের জীবন কেটেছে কেমন করে। জীবন কাটাতে হলে মানুষের চাই খাদ্য, আশ্রয় আর পোশাক-পরিচ্ছদ। কিভাবে সে-যুগের মানুষ ঐ সমস্ত কিছু সংগ্রহ করতেন, কত বাধা-বিপদ দেখা দিত তাঁদের সম্মুখে, কিভাবে তাঁরা সে-সব বাধা-বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন এসবই লেখা থাকে ইতিহাসে। মানুষ যত উন্নত হয়েছে ততই চিন্তা আর বুদ্ধি খাটিয়ে আদিম যুগ থেকে ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করেছেন কিকরে ভালোভাবে জীবন কাটানো যায় এবং কিকরে সকলে মিলেমিশে সুখী সমাজ গড়া যায়। যখন থেকে মানুষ উন্নত আর সুখী সমাজ গড়েছেন তখন থেকেই তাঁরা হয়েছেন সভ্য। এই উন্নত জীবন আর সুখী জীবনধারাকেই বলে **সভ্যতা**।

এইসব সভ্যতার কেমন করে আরম্ভ হল, আর কেনই বা তার পতন হল তা জানা যায় ইতিহাস থেকে। বিভিন্ন সভ্যতার যুগের মানুষের গড়া মঠ, মন্দির, মূর্তি, গুহাচিত্র এ-সমস্তই আমাদের গৌরব আর গর্বের কথা। যুগে যুগে আমাদের যত উন্নতি হয়েছে তার জন্য আমরা ঋণী পূর্বপুরুষদের কাছে। ইতিহাস পড়লে তবেই

আমরা অতীতের গর্বের জিনিস আর পূর্বপুরুষদের ঋণের কথা ভালোভাবে জানতে পারব। বিভিন্ন যুগে নানা সভ্যতার কেমন পরিবর্তন হল তাও পাব ইতিহাসে। সেইসব ইতিহাস যত পড়ব ততই আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসতে শিখব আর সকলের মনে একতার ভাব জাগাতে পারব। ইতিহাস থেকেই অমরা শিখতে পারব কিভাবে আরো ভালো করে দেশ শাসন করা যায়। আর যদি আমরা জ্ঞান চর্চা করি তাহলে ইতিহাস থেকে পাব আরও ভালোভাবে জ্ঞানচর্চার শিক্ষা। সাধারণ মানুষ ইতিহাস থেকে পাবে মানুষের মতো বাঁচার শিক্ষা।

দ্বিতীয় পাঠ

প্রাচীনকালের কথা কী করে জানা যায়

প্রচীনকালের ইতিহাসের আরম্ভেই পড়তে হবে কিভাবে আমরা সে-যুগের কথা জানতে পারি।

দেশভ্রমণ করলে দূরদেশের লোকের কথা জানা যেতে পারে। প্রাচীনকালের ভ্রমণকারীরা তাঁদের ভ্রমণকাহিনী লিখে গেছেন। আলেকজান্দারের সঙ্গের যাত্রীরা, মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েনের মতো ভ্রমণকারীদের লেখা থেকে আমরা সে-যুগের অনেক কথা জানতে পারি। আবার প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকদের লেখা পড়েও অনেক কথা জানতে পারি।

আরও আগে মানুষ লিখতে জানত না। তবে তাঁদের হাতের কাজ, তাঁদের তৈরি যন্ত্রপাতি অনেক কিছু মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকে। মানুষ মরে গেলে তাঁদের দেহের কঙ্কালও মাটির নিচে পাওয়া যায়। সে-যুগের ঘরবাড়িও মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। পুরাতত্ত্ববিদ নামে একদল বিজ্ঞানী মাটির নিচে খননকার্য করে ঐসব জিনিসপত্র থেকে অতীতের জীবনের বিবরণ আবিষ্কার

করেন। যাঁরা অমন খননকার্য করেন তাঁদের বলে **পুরাতত্ত্ববিদ** বা **প্রত্নতাত্ত্বিক**। আর পুরাকালের চর্চাকে বলে **পুরাতত্ত্ববিদ্যা**।

মাটি খুঁড়ে পুরাতত্ত্ববিদেরা যে-সব জিনিসপত্র পান তা খুব ভালো করে দেখাশুনা করে তাঁরা প্রাচীন কালের মানুষের জীবনের অনেক কথা জানতে পারেন। এমনি করেই না রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দেশের মহেঞ্জোদড়োর কথা আমাদের জানিয়েছেন।

এই মহেঞ্জোদড়ো আর হরপ্পার কথা তো তোমরা এর আগে পড়েছ। কত বড়ো স্নানের জায়গা, কত দালান-কোঠা, খেলনা, শহরের নক্‌সা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সীলমোহর, দেবীর মূর্তি, নর্তকীর মূর্তি, আরও কত কি সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব জিনিস থেকেই ঐতিহাসিকরা সে-যুগের জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের। এমনি করেই পুরাতত্ত্ববিদেরা মিশরেরও প্রাচীন কালের সমস্ত খুঁটিনাটি কাহিনীর ইতিহাস লিখেছেন। মেসোপটেমিয়া আর চীনের ইতিহাসও এমনি করেই আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুরাতত্ত্ববিদেরা আমাদের শিখিয়েছেন লক্ষ লক্ষ বছর আগের মানুষের জীবন কেমন ছিল। তাঁরা তখন জংলী জীবন যাপন করতেন। নদীর তীরে কুড়িয়ে-পাওয়া পাথরের নুড়ি দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বানিয়ে শিকার করে, ফলমূল কুড়িয়ে তাঁদের জীবন কাটত। বড়ো বড়ো জীবজন্তু শিকারের সময় তাঁরা দল বেঁধে যেতেন। তাঁদের গায়ে না ছিল পোশাক, না মাথার উপর কোন আশ্রয়। গুহাতেই থাকতেন তাঁরা। পাথরের যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের তিনটে যুগ ছিল—পুরা, মধ্য ও নবপ্রস্তর যুগ। এই তিন যুগের মানুষের জীবনও ছিল আলাদা।

অনেক সময় পুরাতত্ত্ববিদেরা খোঁড়াখুড়ি করে যা পেতেন নিজেরা তার ব্যাখ্যা করতে পারতেন না। তখন তাঁদের সাহায্য নিতে হয় অন্য বৈজ্ঞানিকদের। তাঁদের একদল হলেন নৃতত্ত্ববিদ। এঁদের কাজ হল কি-রকম স্থানে, জলবায়ুতে মানুষের জীবন কেমনভাবে

গড়ে ওঠে, কেমন ছিল তাঁদের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, পরস্পরের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক—তাই আলোচনা। পুরাতত্ত্ববিদেরা যখন কোনও কিছু আবিষ্কার করেন, তখন নৃতত্ত্ববিদরা এগিয়ে এসে তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁরাই নানা ছোটোখাটো জিনিস নেড়ে-চেড়ে বলে দেন তখনকার মানুষের জীবন কেমন ছিল। তারপর যাঁরা ইতিহাস লেখেন তাঁরা ঐসব তথ্য সাজিয়েগুছিয়ে ইতিহাস রচনা করলে আমরা তা পড়ি।

তাহলে আমরা প্রাচীনকালের মানুষের পরিচয় পাই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মাটিতে চাপা-পড়ে-থাকা তাঁদের তৈরি পাথরের হাতিয়ার, নানা উন্নত পাথর ও ধাতুর যন্ত্রপাতি, মূর্তি, মন্দির, দালান-কোঠা, জলের বাঁধ এইসব থেকে। তবে পুরাতত্ত্ববিদরা খননকার্য করে তা আবিষ্কার করেন। আর নৃতত্ত্ববিদরা আলোচনা, গবেষণা করে তার পরিচয় দেন। ঐতিহাসিকরা সেসব তথ্য সাজিয়ে যে ইতিহাস লেখেন শেষ পর্যন্ত আমরা তা পড়েই ঐসব কথা জানতে পারি।

অনুশীলনী

প্রবন্ধ ধরনের প্রশ্ন : (১) বিজ্ঞানীরা প্রাচীন যুগের লোকের কাহিনী কিকরে জানতে পারেন সে বিষয়ে ছোটো প্রবন্ধ রচনা কর। (২) পুরাতত্ত্ব কাকে বলে? পুরাতত্ত্ব কিভাবে ইতিহাসের উপকারে লাগে?

মৌখিক প্রশ্ন : (১) সভ্যতা কাকে বলে? (২) মহেঞ্জোদড়োর কথা আমাদের কে জানিয়েছেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

আদিম মানুষ

আদিম মানুষের উদ্ভব হয়েছে এক জাতের গাছে-বাস-করা গেছো-বনমানুষ থেকে। সে প্রায় দশলক্ষ বছর আগের কথা। এদের দেখা গিয়েছিল মধ্য আফ্রিকায়। তারা চার-পা থেকে দু-পায়ে হাঁটতে শিখেছিল। তবে এরা একেবারেই আমাদের মতো দেখতে ছিল না। তারও কয়েক লক্ষ বছর পরে জাভাতে যে জাভা-মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায় তারা অনেকটা সোজা হয়ে চলত। তিন লক্ষ বছর আগের পিকিংম্যানও সোজা হয়ে চলত। তারাই আগুন আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু তাদের আমাদের মতো দেখতে ছিল না। এর অনেক পরে জার্মানির নিয়ানডার্থাল উপত্যকার নিয়ানডার্থাল মানুষেরা ও ফ্রান্সের ক্রোম্যাগনন মানুষই আমাদের মতো দেখতে ছিল।

আদিম মানুষ কয়েক লক্ষ বছর আশেপাশে ছড়িয়ে-থাকা পাথরের নুড়িকে ভেঙেচুরে কাজের মতো বানিয়েছিল। গাছের ডাল ভেঙে গদা নিয়েছিল হাতে। তখন থেকেই দেখা দিল পার্থক্য। তারপর বিরাট ব্যাপার হল আগুন আবিষ্কার।



আদিম মানুষ—পিকিংম্যান

জীবজন্তুর মতো মানুষও আগে আগুনকে ভীষণ ভয় করত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাদের ভয় ভাঙল। তাদের মধ্যের কেউ হয়তো চকমকি পাথর ঠুকবার সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বালিয়েছিল। নয়তো কেউ বনের দাবানল থেকে আগুন জ্বালিয়ে গুহায় নিয়ে এসেছিল। মানুষ আগুন

আবিষ্কার করে আজ থেকে তিন লক্ষ বছর আগে। আর সে আবিষ্কার করে চীনের মানুষ। চীনের রাজধানী পিকিংয়ের কাছে চৌকো তিয়েন নামে একটি গুহার মানুষই সর্বপ্রথম আগুনকে বশ করেছিল।

খাবার জোগাড়ে মানুষ

গাছ থেকে যেদিন মাটিতে নেমে গেছো-বনমানুষ চার-পা থেকে দু-পায়ে হাঁটতে শিখেছিল তখন থেকেই সে আশেপাশের গাছগাছড়ার ফলমূল কুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে। নিরামিষ খাবার ছাড়াও পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ধরে তারা খেত। তাছাড়া সুযোগ পেলে ছোটো জীবজন্তু শিকার করে তার কাঁচা মাংস খেত। এদের আয়ু ছিল খুব কম। কুড়ি বছরের মধ্যেই রোগে ভুগে বা হিংস্র জীবজন্তুর হাতে এদের মৃত্যু ঘটত। বন্য পশুদের ভয়ে এরা গুহার ভিতরে বাস করত।

আগুন জ্বালাতে শেখার পর আদিম মানুষ গুহার মুখে আগুন জেবলে পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করত আর মাংস আগুনে ঝলসে খেত।

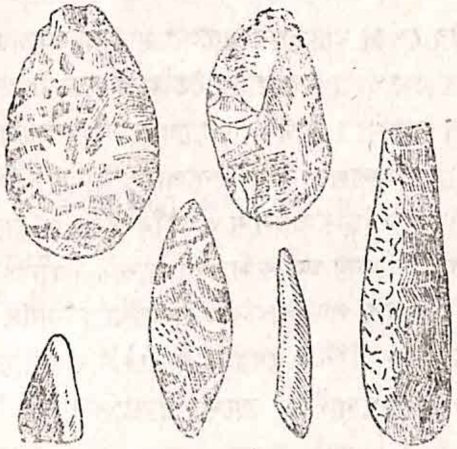
দ্বিতীয় পাঠ

পুরাপ্রস্তর যুগ

পাথরের নুড়ি কি চাপড়া কুড়িয়ে লক্ষ লক্ষ বছর মানুষ হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতির কাজ চালাত। যতদিন মানুষ ধাতু আবিষ্কার করতে পারেনি ততদিন চলেছিল প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগের তিনটে ভাগ—পুরা, মধ্য আর নব প্রস্তর যুগ। তিনটি বিভিন্ন যুগে মানুষ পাথরের যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার রূপ ও কাজ ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের।

যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহার

তিনটি প্রস্তর যুগের মধ্যে পুরাপ্রস্তর যুগই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘকালের। এ যুগের প্রথম ভাগে মানুষ বড়ো পাথরের চাঁই ঠুকে



পুরাপ্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি

ঠুকে ভেঙে ধারালো দায়ের কাজ চালাত। দ্বিতীয়ত ছিল মুঠো-করে-ধরা হাতল-ছাড়া কুড়াল। সেটা দা-য়ের চেয়ে বড়ো আর ভারী। এ কুড়োলের দু-দিকই ধারালো। তৃতীয়ত ছিল বাটালির মতো সরু আর ধারালো পাথর। সেটা দিয়ে জিনিসপত্র চেরা যেত।

পুরাপ্রস্তর যুগের দ্বিতীয় ভাগের যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রধান ছিল ফুটো করার ফোঁড়, তীরের ফলা, আর চাঁছার উপযুক্ত পাতলা ধারালো ছুরি।

এ যুগের শেষের স্তরের যন্ত্রপাতি আরও বদলে যায়। দ্রুতগামী জীবজন্তু শিকারের উপযুক্ত তীক্ষ্ণধার পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এযুগের বৈশিষ্ট্য। ছুঁড়ে মারা যায় এমন অর্ধচন্দ্রের মতো ফলার অস্ত্র এযুগের শিকারীদের শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিল। পুরাপ্রস্তর যুগের একেবারে শেষ স্তরে মানুষ খুব ভালোভাবে খাবার জোগাড় করে তা সংরক্ষণ করতে শিখেছিল। সেজন্যে এর পরের যুগে তারা কৃষিকাজ আবিষ্কার করতে পারে।

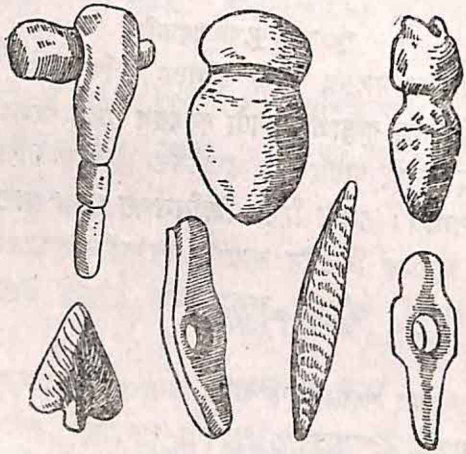
তৃতীয় পাঠ

নবপ্রস্তর যুগ (৮০০০ খ্রীপূঃ পর্যন্ত)

যন্ত্রপাতির বিবর্তন

পুরাপ্রস্তর যুগের শেষে মধ্যপ্রস্তর যুগের মানুষ আগের চেয়ে অনেক ছোটো ছোটো অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শিখেছিল।

তারপর এল নবপ্রস্তর যুগ। এযুগে মানুষ আগের সব যুগের চেয়ে অনেক ভালো অস্ত্রশস্ত্র আর যন্ত্রপাতি বানাতে শিখল। পুরা-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ছিল অমসৃণ ও অনির্দিষ্ট আকারের। নবপ্রস্তর যুগের মানুষ পালিশ করা মসৃণ সুন্দর সুন্দর জিনিস বানিয়েছিল। এযুগের মানুষ চাষবাস, পশুপালন আর ঘরবাড়ি বানাতে শিখেছিল। আগের মতো যাযাবর-জীবন তাদের ছিল না। নূতন যুগের উপযোগী কাজের নতুন নতুন যন্ত্রপাতিও তাদের বানাতে হল।



নবপ্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি

প্রথমেই জমি চাষবাসের উপযুক্ত খন্তা বা কোদালের দরকার হল। কাঠের হাতল দেওয়া তীক্ষ্ন পাথরের ফলা দিয়ে মাটি খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হল। তারপর এল ফসল কাটার জন্য কাস্তে। পাথর

ভেঙে তা থেকে অর্ধচন্দ্রের মতো বাঁকা ফলা তৈরি করা হল। সেটাও কাঠের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। তারপর এল বড়ো কুড়োল। আগের যুগের কুড়োলের বদলে লম্বা কাঠের হাতলের মুখে শক্ত পাথরের ধারালো ফলা বসিয়ে সে কুড়োল তৈরি হল। এ দিয়ে বনজঙ্গল সাফ করার কাজ অনেক সহজ হল। ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার হল শস্য পেষাই করার জন্য উলুখল, জাঁতা ইত্যাদি, আর শস্য ও জল সঞ্চয়ের জন্য মাটির পাত্র।

মানুষ খাদ্য উৎপাদন করল

সমস্ত পুরাপ্রস্তর যুগ ধরেই মানুষ ছিল প্রকৃতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। বনের ফলমূল যোগাড় করে নয়তো বনের পশু শিকার করে অনিশ্চিতভাবে তাদের জীবন কাটত।

ক্রমে ক্রমে মানুষ তার চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখী স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনেরও ইচ্ছা তাদের হল। সে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিল কৃষিজ আবিষ্কার।

মানুষ এতদিনে নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে পারল। তাকে আর খাবারের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাযাবর জীবনযাপন করতে হবে না। একই জায়গায় স্থায়ী ঘরবাড়ি করে সে সুখে চাষীর জীবনযাপন করতে পারবে।

পৃথিবীর সর্বত্র কিন্তু একই সময়ে মানুষ চাষবাস শেখেনি। ভারতের বুকে এই পরিবর্তন এসেছে মাত্র চার-পাঁচ হাজার বছর আগে।

চতুর্থ পাঠ

নবপ্রস্তর যুগের বিপ্লব

পশুপালন

নবপ্রস্তর যুগের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার মানুষের উৎপাদন-ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটাল। নতুন হাতিয়ার নিয়ে কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে সমাজব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন এল। পুরাপ্রস্তর যুগের জীবনের সঙ্গে এ-জীবনের অমিল বলে একে একটা বিপ্লব বলা হয়েছে।

আগে মানুষ পশু শিকার করে তার মাংস খেয়েই সন্তুষ্ট হত। এখন মানুষ বনের ছোটো ছাগল, গোরু একেবারে না মেরে বন্দী করে পুষতে লাগল। তারপর দেখল ছাগল গোরু পুষলে যথা সময়ে তাদের দুধ খেয়ে খিদে মেটানো চলে। আর তাদের আপনা থেকেই বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। পশুপালন করলেও খাবারের যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়। কৃষিকাজের মতো পশুপালনও মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভরতার হাত থেকে রক্ষা করল।

মৃৎপাত্র নির্মাণ

কৃষিকাজ ও পশুপালনের পাশাপাশি মানুষের দরকার হল শস্য, জল, দুধ সঞ্চয় করে রাখার মতো পাত্রের। প্রথমে মেয়েরা কাদামাটি থেকে হাতে হাতে খাবার থালা, জলের ঘটি, হাঁড়ি, কলসি বানাতে আরম্ভ করে। তারপর তা রোদে শুকিয়ে নিত। আবার অনেকে বাঁশের কঞ্চি, কি লতা-পাতা দিয়ে চাঙাড়ির মতো করে কলসি বানিয়ে তার উপর কাদামাটির প্রলেপ লাগিয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিত।

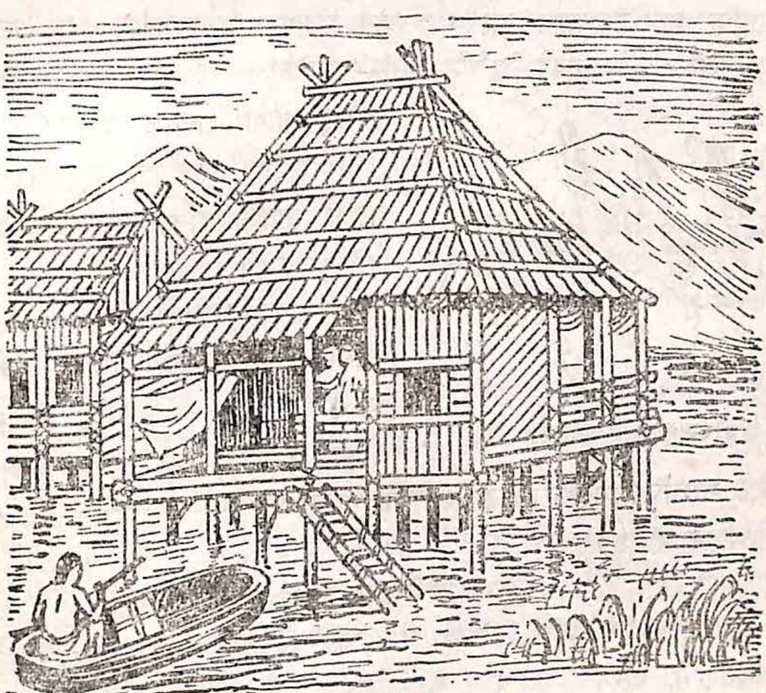
কাপড় বোনা

নবপ্রস্তর যুগের মানুষ কাপড় বুনতে শিখেছিল। এতদিন আদিম মানুষ গুহায় আগুন জ্বালিয়ে শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা

করত। আগের যুগে চামড়ার সরু সরু ফিতে কেটে জাল বোনার মতো করে কাপড় বুনত। শুধু চামড়া নয়—গাছের পাতার আঁশ জুড়েও ঐভাবে কাপড় বোনা হত। তাছাড়া বাকলের পরিচ্ছদের ব্যবহারও ছিল। এখন রীতিমতো তুলো থেকে সুতো কেটে কাপড় বোনা হতে থাকে।

ঘরবাড়ি

মানুষ এতদিনে স্থিতিশীল হয়েছে। নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করায় গাছ কেটে শক্ত খুঁটি দিয়ে ঘর বানাতে আর কষ্ট হত না।



হ্রদবাসীদের বাড়ি

যেসব অঞ্চলে পাথর পাওয়া যেত সেখানে পাথরের ঘরবাড়ি বানানো হত। ঘরগুলো প্রধানত কুটিরের মতো ছিল। হিংস্র পশুদের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘরগুলো খুব কাছাকাছি তৈরি

হত। একই গোষ্ঠীর লোকজনের ঘরবাড়ি ঘরে পাথর কি শক্ত কাঠের গঁড়ির বেড়া থাকত। মাছধরা যাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল তারা অনেকে হ্রদের মধ্যে পাটাতনের উপরে বাড়ি করত আর নৌকায় করে তীরে যাতায়াত করত। এমন হ্রদবাসীদের বাড়িরও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

আদিম যানবাহন

নবপ্রস্তর যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল চাকা। চাকার সাহায্যে মানুষ জীবনে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এল। চাকা আবিষ্কারের ফলে মানুষ আর দূরের পথ পায়ে না হেঁটে গাড়িতে আরাম করে যাতায়াত আরম্ভ করল। আগের মতো কাঁধে করে ভার না বয়ে ভারী ভারী জিনিস গাড়িতে টানতে লাগল। পোষ-মানা গোরু গাধা প্রভৃতি হল গাড়ি টানার জীব। এতে দূর-দূরান্তরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অনেক সুবিধা হল।


চাকাওয়ালা গাড়ি—মহেঞ্জোদড়ো

স্থলপথে যেমন হল গাড়ি তেমনি জলপথের বাহন হল নৌকা। উন্নত যন্ত্রপাতি দিয়ে বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি ফাঁপা করে শালতির মতো নৌকা বানিয়ে সমুদ্র-পথেও এই যুগের মানুষ যাতায়াত করত।

সমাজজীবনের আরম্ভ

নবপ্রস্তর যুগের বিপ্লবে মানুষের জীবনে অতি দ্রুত নানা পরিবর্তন ঘটল। চাষবাস, ঘরবাড়ি বানানো, শিকার, পশুপালন ইত্যাদি করতে গিয়ে গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধ আরও বাড়ল। উৎপন্ন ফসল, গবাদি পশু ও অন্যান্য যা কিছু সহায়-সম্পত্তি তার ওপর গোষ্ঠীর সকলের মিলিত কর্তৃত্ব ছিল। গোষ্ঠীর বয়স্কদের পরিচালনায় শিকার, মাছধরা ও চাষের কাজ চলত। পরিবারের সবচেয়ে

বয়স্ক ও দক্ষ লোকেরাই হতেন নেতা। একই স্থানে বসবাসকারী কয়েকটি পরিবার মিলে তখন এক-একটি কুল গড়ে উঠল। বিভিন্ন কুল তাদের নিজেদের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করত।

পঞ্চম পাঠ

ধর্ম-বিশ্বাস

পুরাপ্রস্তর যুগের মতো মানুষ এখন আর সত্য সত্যই অত অসহায় ছিল না। তবু প্রকৃতির নানা ঘটনায় এ যুগের মানুষ ভয়ে আত্মহারা হত। ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করতে লাগল। কোন্ শক্তি প্রকৃতিকে চালাচ্ছে সে রহস্যভেদের চেষ্টা আরম্ভ হল।

মৃত্যুকেও আদিম মানুষের কাছে ঘুমের মতো মনে হত। আত্মা দেহ ছেড়ে যায় বলেই লোকের মৃত্যু হয়। মানুষ যেখানে বাস করত তার কাছেই আত্মা থাকে বলে সকলের বিশ্বাস ছিল। সেই আত্মা গোষ্ঠীর সকলের ভালো করতেন বলে ধারণা থাকায় তাঁর পূজা করে আশীর্বাদ প্রার্থনা আরম্ভ হল। এইভাবে শুরু হল পূর্বপুরুষদের পূজা।

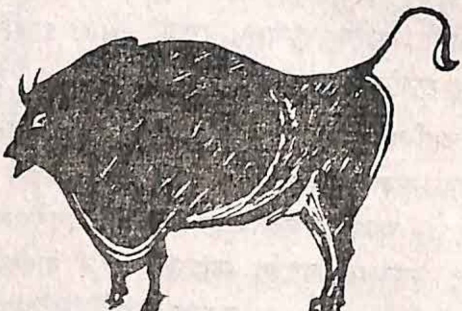
দেবদেবীর পূজাও ধীরে ধীরে এরকম করেই দেখা দিল। জীবজন্তু, গাছপালা, আকাশ, পৃথিবী সমস্ত কিছুরই আত্মা ছিল। এইসব আত্মার কিছু ছিল ভালো—আর কিছু খারাপ আত্মা মানুষের রোগ, দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়ী। ভালো আত্মাদের দেবদেবী বলে পূজা আরম্ভ হল। এইসব দেবদেবীই প্রকৃতির শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেবদেবীর তুষ্টির জন্য নরবলি কি পশুবলিও করা হত।

দেবদেবী ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসকেই বলে ধর্মবিশ্বাস। হাজার হাজার বছর আগে এই ধর্মবিশ্বাসের আরম্ভ।

শিল্পকলা চর্চা

আদিম শিকারীরা মনে করত যে শিকারী জীবজন্তু তাদের হিতৈষী। যে-কুলের লোক যে-পশুর শিকার করত তাকে পূর্ব-পুরুষদের প্রতীক বলে পূজা করত। পশুটি যেন দয়া করে তাদের হাতে নিহত হয়ে গোষ্ঠীর সকলের খাদ্য যোগাচ্ছে।

সেজন্য শিকারে যাওয়ার আগে শিকারীরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রতীক পশুদের ছবি গুহার দেয়ালে এঁকে তার সম্মুখে নাচ-গান করে যাদু করে শিকারে যেত। এইসব যাদুর ছবি আঁকা থেকেই সে-যুগের শিল্পচর্চার সূত্রপাত। বহু জায়গায় আদিম মানুষের বাসস্থানের কাছের গুহায় এমন যাদুচিত্রের নিদর্শন দেখা গেছে।



আলতামিরা বাইসন

তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে স্পেন দেশের আলতামিরা গুহার বাইসনের চিত্রটি।

প্রকৃতপক্ষে গুহাচিত্র থেকেই প্রধানত সে-যুগের ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ষষ্ঠ পাঠ

ভাষা আবিষ্কার

একসঙ্গে নানা লোক কাজকর্ম করতে লাগলে পরস্পরের মধ্যে মনের ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য নবপ্রস্তর যুগেই মানুষ একপ্রকার ভাষা সৃষ্টি করেছিল। সে ছিল **ভঙ্গিভাষা**। বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে লোকে অন্যকে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করত। ভঙ্গিভাষা থেকে উদ্ভব হয় চিত্রলিপির। পরবর্তী কালে নানা রকমের ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করা হত। তার উদাহরণ মিশরের চিত্রলিপি। লোক তখনো লিপি আবিষ্কার করতে পারেনি বলে ভাষা ছিল অপরিচিত।

ভাষা আবিষ্কারের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বংশপরম্পরায় প্রচলিত করা সম্ভব হল।



মাতৃমূর্তির পূজা

সূর্য, আকাশ, বজ্র, বিদ্যুতের মতো পৃথিবীরও আত্মা ছিল বলে লোক বিশ্বাস করত। মাতা থেকে যেমন শিশুদের জন্ম হয়, মাতার দুধ পান করে যেমন শিশুরা বেড়ে ওঠে, তেমনি সকলের মাতা এই পৃথিবীও তাঁর উর্বরা শক্তির জন্য ফসল জন্মাতে সাহায্য করেন। সেজন্য উর্বরা শক্তির প্রতীকরূপে মাতার মূর্তি গড়ে পূজা আরম্ভ হল। এমন ছোটো বড়ো অজস্র মতৃমূর্তি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রে পাওয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী

প্রবন্ধ ধরনের প্রশ্ন ঃ (১) আদিম মানুষের জীবন কেমন ছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (২) মানুষের আগুন আবিষ্কারের কাহিনী গল্পের আকারে লেখ। (৩) পুরাপ্রস্তর যুগে মানুষ কেমন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত? (৪) নবপ্রস্তর যুগে আগের কি পরিবর্তন ঘটে? সে-যুগের অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ে কি জান তা লিপিবদ্ধ কর। (৫) নবপ্রস্তর যুগের মানুষের খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে রচনা লেখ। (৬) নবপ্রস্তর যুগে মানুষ কী কী নতুন জিনিস ও কৌশল আবিষ্কার করেছিল? তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (৭) নবপ্রস্তর যুগে মাতৃমূর্তির পূজা হত কেন?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ (১) মানুষের প্রথম আগুন আবিষ্কারের সময় কখন? (২) কোন্ যুগের শেষে মানুষ কৃষিকাজ আবিষ্কার করে? (৩) মানুষ কোন্ পশুকে প্রথম পোষ মানায়? আদিম মানুষের সমাজজীবনের আরম্ভ হয়েছিল কখন?

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

প্রথম পাঠ

ধাতুর আবিষ্কার

নবপ্রস্তর যুগের শেষে মানুষ ধাতু আবিষ্কার করে। সে ধাতু হচ্ছে তামা। তাছাড়া টিন বা দস্তাও আবিষ্কার হয়। তামার সঙ্গে টিন কি দস্তা মিশিয়ে ব্রোঞ্জ নামে আর একটি শক্ত ধাতুও উৎপাদন করা হতে থাকে। এসব ধাতু আবিষ্কারের ফলে মানুষের আরও অগ্রগতি ঘটল। তার জীবনধারাতেও এল নানা পরিবর্তন। এতদিন পাথরের যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষবাস, শিকার প্রভৃতি সমস্ত উৎপাদনের কাজ চলত। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের জীবনযাত্রার একটা ধারা গড়ে উঠেছিল। এখন শক্ত ধাতু পেয়ে মানুষের শক্তি

অনেক বেড়ে গেল আর তার জিনিসপত্র উৎপাদনের পদ্ধতিও বদলে গেল।

এখন বন-জঙ্গল সাফ করা অনেক সহজ হল। চাষবাসের উন্নতি হল। গাড়ি, নৌকা—এসবও অনেক উন্নত ধরনের হল। ফলে মানুষের জীবনে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এল।

নগরের উদ্ভব

দিন যায়, কাল যায়। ছোটো ছোটো গ্রামগুলি ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠল। এসব বড়ো বড়ো গ্রামে লোকজনের বসতিও বাড়ল। যত লোক বাড়ল ততই তাদের অভাব ও নতুন জিনিসের চাহিদাও বেড়ে চলল। বড়ো বড়ো গ্রামের লোকেরা নতুন ধাতুর জিনিসপত্র দিয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী খাদ্য ও আহার্য উৎপাদন করছিল। কাজেই তাদের অবস্থার উন্নতি হল। ঐসব গ্রামের প্রয়োজনের তুলনায় ধন-সম্পদও বাড়ল।

বড়ো বড়ো গ্রামের লোকের চাহিদা বাড়ল মাটি ও ধাতুর বাসন-কোসনের, ভালো ভালো কাপড়-চোপড়ের, গহনা ও অলঙ্কারের, ঘরের আসবাবপত্রের, চাষবাসের যন্ত্রপাতির—এমনি আরও নানা জিনিসের। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে যে খাদ্য বাড়তি হল তার বদলে কৃষকেরা এই জিনিসপত্র কিনে অভাব মেটাত।

এখন আর একই লোকের নিজের প্রয়োজন মেটাবার সমস্ত কিছু স্বয়ং উৎপাদন করতে হত না। কামার, কুমোর, ছুতোর, স্যাকরা সবাই নিজের নিজের জিনিসের বদলে খাদ্য সংগ্রহ করত। ক্রমে ক্রমে যত উৎপাদন বাড়ল ততই বিভিন্ন বিষয়ের কারিগর ও হস্ত-শিল্পীরা একত্র বসবাস আরম্ভ করল। এবং ঐসব বড়ো বড়ো গ্রাম দেখতে দেখতে নগরে পরিণত হল।

বিশেষ লোকের বিশেষ কাজ

নগরের কারিগর, হস্তশিল্পী ও কৃষকদের কাজের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দিল। তাঁতী শুধু কাপড় বুনল, কামার শুধু ধাতুর

২

প্রয়োজনীয় জিনিস বানাল, কুমোর তৈরি করল শুধু মাটির বাসন-কোসন। এমনিভাবে তাঁতীর ছেলে শিখল তাঁত চালান, কামারের ছেলে শিখল ধাতুর কাজকর্ম, কুমোরের ছেলে শিখল মাটির বাসন-কোসন তৈরি। এ সমস্ত কাজেই বিশেষ পটুত্ব দরকার। বংশপরম্পরায় বাবা ছেলে এসব কারিগরি বিদ্যা আরম্ভ করল। ক্রমে ক্রমে তাদের কাজ যেমন ভালো হল তেমনি উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ল।

যখন বিশেষ বিশেষ কাজ কোনও এক শ্রেণী বিশেষ করে তৈরি করে তখন সে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে শ্রমবিভাগ বা বিশেষীকরণ বলে। নগরের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কাজের শ্রমবিভাগ বা বিশেষীকরণ দেখা দিল। বিশেষীকরণের ফলে সব জিনিসের উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ল।

দ্বিতীয় পাঠ

ব্যবসা ও দ্রব্য বিনিময়

নতুন যেসব নগর সৃষ্টি হল তার বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রমবিভাগ দেখা দিয়েছিল। সমাজে যতই নতুন নতুন জিনিসের চাহিদা বাড়তে থাকল ততই নতুন নতুন কারিগর সৃষ্টি হতে লাগল। তখন নগরের সমস্ত কারিগর, হস্তশিল্পী ও কৃষকদের পরস্পরের মধ্যে উৎপন্নদ্রব্য বিনিময় হতে লাগল। পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের লেনদেন ও বিনিময়কেই ব্যবসা বলে।

যানবাহন ব্যবস্থারও ইতিমধ্যে অনেক উন্নতি হয়েছিল। কাজেই নগরের মধ্যে যাদের হাতে ধন-সম্পদ বেশি জমেছিল তারা কারিগরদের কাছ থেকে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে উন্নততর স্থল বা নৌ-যানে করে নগরের মধ্যে কিংবা দূর-দূরান্তের বর্ধিষ্ণু নগরেও বিক্রি করতে যেত। গাড়ি বা নৌকায় করে মালপত্র বহন করা হত। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ থেকে দেখা গেছে যে সিন্ধু, সুমের, মিশর-এর মতো দূরের দেশের মধ্যেও রীতিমতো বাণিজ্য চলত।

সামাজিক জীবনের রূপান্তর

নবপ্রস্তর যুগের জীবন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে সমাজের গোধন বা শস্য সমস্ত কিছুর উপর গোটা গোষ্ঠীরই অধিকার ছিল। আলাদা করে কেউ কোনও জিনিস নিজের বলে দাবি করতে পারত না অর্থাৎ সে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না।

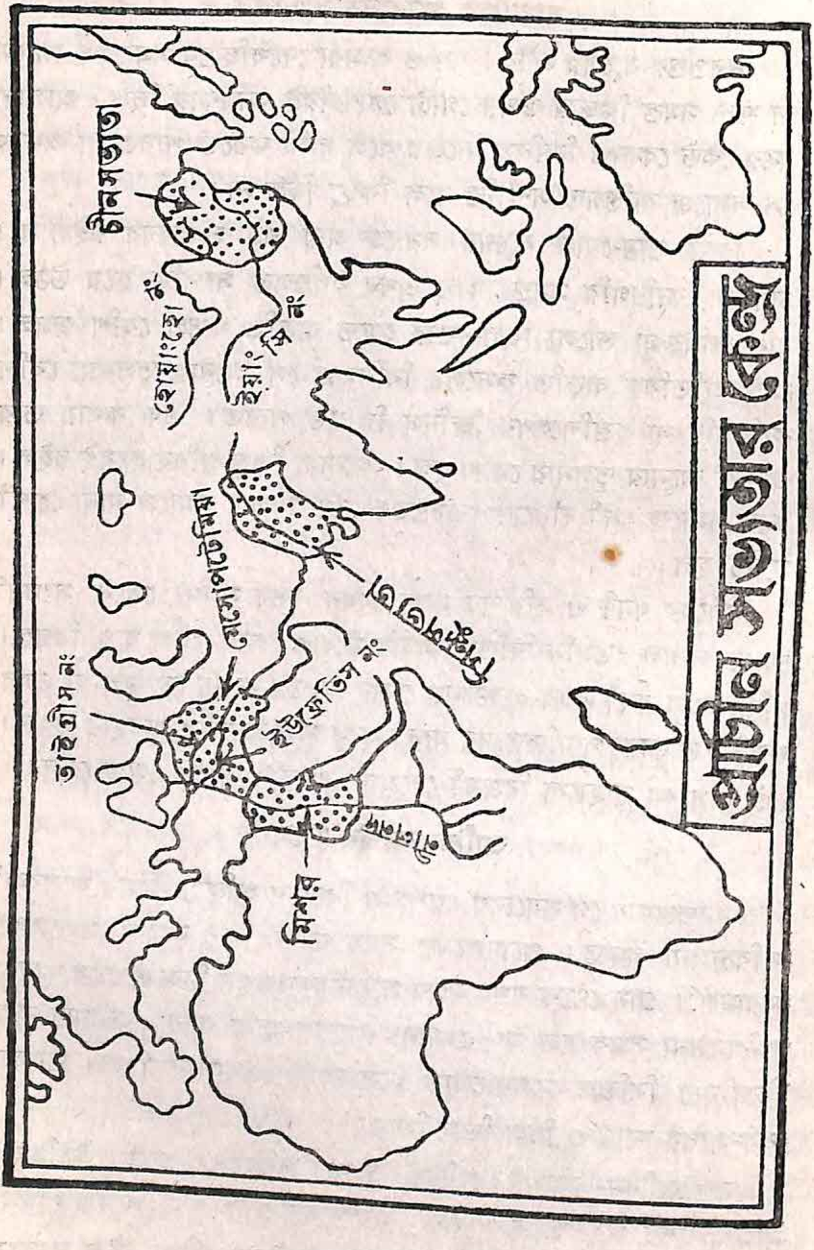
কিন্তু তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সমাজে আর এই সাম্যভাব রইল না। চাষবাস, কারিগরি সমস্ত কিছু এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে উঠল। যার জমিজমা ভালো ছিল—তার হাতে বাড়তি ফসল বেশি জমল। সেই অতিরিক্ত বাড়তি ফসলের বিনিময়ে সে অন্যের তুলনায় বেশি কারিগরি বা হস্তশিল্পের জিনিস কিনতে পারত। এক কথায় তার ঐশ্বর্য অন্যের তুলনায় বেশি হল। অন্যেরা কিন্তু গরিব হয়েই রইল। ফলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দেখা দিল। সমাজে নানা শ্রেণী সৃষ্টি হল।

নগরের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যেমন ভেদ সৃষ্টি থেকে সংঘর্ষ চলতে লাগল, তেমনি বিভিন্ন কুলের মধ্যেও লেগে রইল যুদ্ধ-বিগ্রহ। দরিদ্র নগর ধনী নগর লুণ্ঠনের চেষ্টা করত। যুদ্ধে যে কুল বা নগর জয়ী হত তারা পরাজিতদের বন্দী করে দাস হিসেবে ব্যবহার করত। এই দাসদের সাহায্যে বিজয়ী দেশের উৎপাদন আরও বেড়ে গেল।

আদিম রাষ্ট্রের উদ্ভব

নবপ্রস্তর যুগে সবচেয়ে বয়স্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কুলের কাজকর্ম পরিচালনা করত। প্রয়োজনের সময় তারা নিত কুলের সকলেরই পরামর্শ। গ্রাম থেকে যখন নগর সৃষ্টি হল তখন ঠিক ঐভাবে কুলের পরিচালনা সম্ভব হল না; কেননা নগরের মধ্যে আর একটামাত্র কুল ছিল না। বিভিন্ন কুলের লোক এসে নগরে বসবাস করছিল। তাদের পরস্পরের স্বার্থও ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

নগরজীবন ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছিল। নাগরিকদের পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ধরনের শাসন-ব্যবস্থার দরকার হল। এই শাসনব্যবস্থার উপর দায়িত্ব রইল নগরের


প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র
চীনসভ্যতা
হোয়াংহো নং
ইয়াং সি নং
মেসোপটেমিয়া
টাইগ্রীস নং
ইউফ্রেতিস নং
নীলনদ
মিশর

শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আইন-কানুন রচনা, আর নগরের দৈনন্দিন কাজ চালানোর ব্যবস্থা। কালক্রমে নগরগুলির সমাজে শাসন, রাজা ও আদিম রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হল। এই রকম সভ্য সমাজের আইন রচনা, হিসাব-নিকাশ করা, বিচার করা ও লোকজনের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য দরকার হয় লিপির। সেজন্য এই চারটি সভ্যতার কেন্দ্রেই প্রত্যেকের নিজস্ব লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

নদী-উপত্যকায় সভ্যতার উদ্ভবের কারণ

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের পৃথিবীর কয়েকটি নদী-উপত্যকায় পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। যথা, পশ্চিম এশিয়ায় ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যে মেসোপটেমিয়ায়, আফ্রিকার উত্তরে নীলনদের দুই তীর জুড়ে মিশরে, পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদী ও তার শাখাপ্রশাখা ঘিরে হরপ্পা সভ্যতা ও হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং নদী উপত্যকায় চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতা।

এর কারণ ঐ সমস্ত অঞ্চলের জলবায়ু, জমি প্রভৃতির অবস্থা সভ্যতা বিকাশের পক্ষে অনুকুল ছিল। নদী ও উপত্যকায় প্রতি বৎসর বন্যায় পলিমাটি জমে ভূমির উর্বরা শক্তি বাড়িয়ে দেয়। চাষবাস তাতে সহজে হতে পারে, চাষের জন্য যে জল দরকার তাও নদী থেকে সংগ্রহ করা অনেক সহজ। জমির উর্বরা শক্তি বেশি বলে কৃষকেরা সহজে নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ফসল উৎপন্ন করতে পারত। অনেক লোক মিলেমিশে কাজ করার সুযোগও এখানে বেশি ছিল। বন্যার সময়ে সমবেত চেষ্টায় বাঁধ বেঁধে, খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা ও বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা করায় ঐ অঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সংগঠনের বিকাশ ঘটে। কালক্রমে নদীপথে চলাচলের সুবিধাও ঐসব অঞ্চলে সভ্যতা বিস্তারের অন্যতম কারণ ছিল।

অনশীলনী

প্রবন্ধ ধরনের প্রশ্ন: (১) নগরের উদ্ভবের সঙ্গে কিভাবে বিশেষীকরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটল সেবিষয়ে ছোটো নিবন্ধ রচনা কর। (২) আদিম সমাজে শ্রেণীভেদ কিকরে এল এবং আদিম রাষ্ট্রের কাঠামো কিভাবে রচিত হল তা লেখ।

মৌখিক প্রশ্ন: (১) বিশেষীকরণ কী বোঝ? নবপ্রস্তর যুগে সামাজিক জীবনে কী রূপান্তর ঘটেছিল?

চতুর্থ অধ্যায়

আদিযুগের সভ্যতার পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীনযুগের মেসোপটেমিয়া

প্রথম পাঠ

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর থেকে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ বৎসর পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, ভারত ও চীনের বিভিন্ন নদী-উপত্যকার



তীরে উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এ পরিচ্ছেদে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন যুগের সভ্যতার কথা জানা যাবে।

এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে, আর্মেনিয়ার পর্বত থেকে ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস নামে দুটি নদী প্রবাহিত হয়ে দূরে পারস্য উপসাগরে গিয়ে মিশেছে। নদী দুটির মাঝের জায়গাটিকে মেসোপটেমিয়া বলে। এর উত্তরের দিকে পাহাড়িয়া অঞ্চল, মাঝখানে ও নিচে বিস্তৃত সমভূমি।

মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে সুমের অঞ্চল কাদামাটি দিয়ে গড়া। শীতকালে আর্মেনিয়ার পাহাড়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তখন সেই পাহাড়ের পলি নদীর বন্যার স্রোতে এসে এই সমভূমিতে জমে। তার ফলে এখানকার জমি খুব উর্বরা। উর্বরা জমির লোভে আশে-পাশের আদিম মানুষ এখানে ভীড় জমাতে থাকে। স্থানে স্থানে জলা জমি ও নলখাগড়ার জঙ্গলের মধ্যে তাদের গোষ্ঠিগত বসতি স্থাপিত হয়। সে খ্রীষ্টের জন্মেরও কয়েক হাজার বৎসর আগের কথা। বসতিগুলিতে ছিল কয়েকটি করে মেটে কোঠা। জলা জমি পরিষ্কার করে এখানকার লোক এক আদি সভ্যতার পত্তন করে। তারা তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত আর তা দিয়ে দরকার মতো যন্ত্রপাতি বানাতে পারত। কাদামাটি চষার উপযুক্ত একরকম লঙগলও তারা অবিষ্কার করেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এটাই ছিল সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা।

জমির উর্বরতা ও ফসল

শীতকালে সুমের অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। তখন চারিদিকে থক্‌থকে কাদা জমে ওঠে। আবার বসন্তকালে আর্মেনিয়ার পাহাড়ের বরফ গলতে আরম্ভ করলে প্রবল স্রোতে নদী দুটিতে বন্যা নামে। বন্যায় পাহাড়ের গা ধুয়ে হলদে পলি নেমে আসে নদীর স্রোতের সঙ্গে। নদীর দুকূল ছাপিয়ে সে গিয়ে জমে কাদামাটির মধ্যে। তাতে ঐ অঞ্চলের জমি অত্যন্ত উর্বর হয়ে ওঠে। তাছাড়া নদী থেকে খাল কেটে চাষের জলসেচের ব্যবস্থা সুমেরের লোকেরা করত।

৪০০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে এই সেচব্যবস্থা সুমের সভ্যতার একটি বিরাট দান এবং সুমের-এর সমৃদ্ধির মূলেও আছে তার সেচব্যবস্থা।

এই উর্বর জমিতে জলসেচ করে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সুমেরের কৃষকেরা প্রচুর পরিমাণে গম, যব ও শাকসবজি উৎপাদন করত। একটি বীজ থেকে যে গাছ হত, তাতে উৎপন্ন হত শ' খানেক শস্যবীজ।

যেখানে লোকের বসতি ছিল তা ঘেরা থাকত খেজুর গাছ দিয়ে। খেজুর থেকে ময়দা, মধু ও মদ তৈরি হত। খেজুর গাছের বাকলের আঁশ ও পাতা দিয়ে দড়ি ও ঝুড়ি বোনা হত। খেজুর মেসোপটেমিয়ায় এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে খেজুর গাছকে ''জীবনবৃক্ষ'' বলা হত।

দাস ও প্রভুশ্রেণীর উদ্ভব

মেসোপটেমিয়ায় কৃষিব্যবস্থার উন্নতির ফলে যখন বড়ো লোকের হাতে বাড়তি ফসল জমতে থাকল, তখন থেকে সেখানে ধনী-দরিদ্রের ভেদ দেখা দিল। যুদ্ধ-বন্দীদের দিয়ে তখন জমিদাররা দাস হিসেবে জমি চাষ করিয়ে নিজেদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করত। দাসদের শ্রমে যে বাড়তি ফসল উৎপন্ন হত দাস-প্রভুরা তা বিনিময় করে সোনা, ব্রোঞ্জের জিনিস, নয়তো পোশাকপরিচ্ছদ কিংবা অলংকার কিনত। দাস ও প্রভুদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল মেসোপটেমিয়ার সমাজ।

দ্বিতীয় পাঠ

বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা

মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস নদীতে চিরকাল প্রবল স্রোতে বিপুল পলিমাটি নিচে নেমে আসে। বছরের পর বছর সেই পলিতে নদীর তলা উঁচু হয়ে চড়া পড়ে। তখন নদীর স্রোত দুকূল ছাপিয়ে দু-পাশের জমিজমা বসতি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদীর এই বন্যা

আসবার কোন সময় ছিল না। সুদূর পাহাড়ের আবহাওয়ার উপরে তা নির্ভর করত।

সেজন্য নদী দুটির বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা এক বিরাট সমস্যা হয়ে উঠেছিল। সুদূর পাহাড়ের উপর থেকে পাথর কেটে নদীতে তাঁরা বাঁধ দিলেন। তারপর প্রায় ১০০ হাত চওড়া এক-একটা খাল কেটে নদীর জল দূরের মাঠে টেনে নেওয়া হত। এত চওড়া খাল কাটার ফলে নদীর বাঁধ ভাঙত না আর সারা বছরের মতো জলসেচের ব্যবস্থা হত। এ সমস্ত ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে সুমেরবাসীরা বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখেছিল।

অন্যান্য উপজীবিকা

কৃষি ছাড়া পশুপালন আর নানা কারিগরি ও হস্তশিল্পের উপজীবিকা ছিল সুমের-এর অধিবাসীদের।

ব্যাপকভাবে ধাতুর জিনিস ব্যবহারের আগে পোড়ানো মাটির কাস্তে দিয়ে এরা ফসল কাটত। পশু দিয়ে লাঙ্গল চালাত। কাঁচের জিনিস ও কুমোরের চাক সম্ভবত সুমের অঞ্চলেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানকার নগরগুলি ছিল পাহাড়ের উপরে। সেখানে তাঁতী, কামার, চর্মকার, কুমোর ও অন্য নানা কারিগরের বাস ছিল। পশমের কাপড়ের জন্য মেসোপটেমিয়া খুব বিখ্যাত ছিল। উর নগরের এক রাজার সমাধি থেকে সোনা রূপার বীণা, অলঙ্কার ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। সে-সব কাজও অতি উচ্চাঙ্গের।

তৃতীয় পাঠ

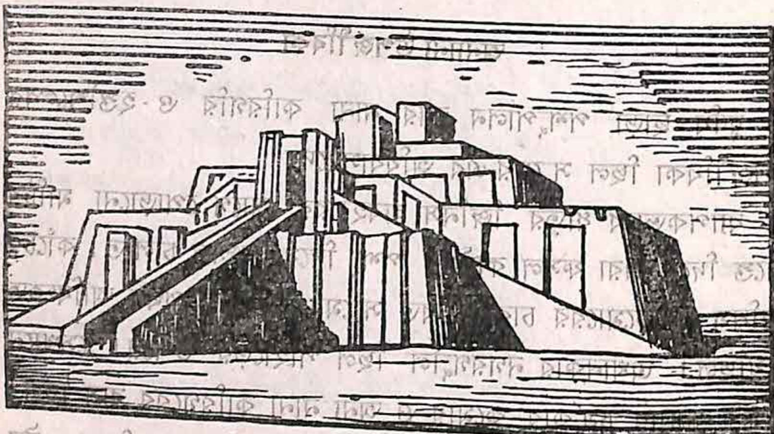
সুমেরীয়দের কৃতিত্ব: উঁচু উঁচু মিনার

ইউফ্রেটিস নদীর বদ্বীপে প্রথম যুগে সুমেরীয়রা খেজুর গাছের কান্ড, নলখাগড়ার ঘর বানিয়ে মাটির ঘন প্রলেপ দিয়ে দিত। পরে,

তারা পোড়া-ইটের দালানকোঠা বানাত। এ অঞ্চলে কাঠ পাওয়া যেত না বলে সুমেরীয়রা প্রথমে খিলান দিয়ে বাড়ি বানাতে আরম্ভ করে। এরা অনেক আকর্ষণীয় মিনারও নির্মাণ করেছিল। বাড়ির মাথায় গম্বুজ দেওয়াও এদের রীতি ছিল।

রোদে-পোড়ানো ইটের মন্দির

রোদে-পোড়ানো ইট দিয়ে সুমের-এর লোকেরা দেবতাদের মন্দির গড়ত। সুমের-এর প্রধান নগর ছিল এরেক, এরিদু, লাগাশ এবং উর। এরা প্রত্যেকটিই এক-একটি নগর রাজ্য। প্রত্যেক নগরেরই



জিগুরাট মন্দির

নিজস্ব দেবতার মন্দির ছিল। মন্দিরগুলি কৃত্রিম পাহাড়ের উপর ইট দিয়ে তৈরি হত। তাকে বলা হত জিগুরাট বা 'স্বর্গের পাহাড়'। এসব মন্দির তিনতলা আর প্রায় চল্লিশ হাত উঁচু হত। নগর-দেবতা ব্যতীত অন্য দেবতাদের অনেক মন্দির সেখানে ছিল। ওসব প্রধান দেবতার মন্দির থেকেই নগর শাসন করা হত।

ফ্রেস্কো, পাথর কাটা ও ধাতুশিল্প

সুমের অঞ্চলে আবিষ্কৃত মন্দিরের দেয়ালে অনেক চিত্র দেখা

গেছে। দেওয়ালের গা মসৃণ করে বিশেষ পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনকে ফ্রেসকো বলে।

মেসোপটেমিয়ার নিনেভে শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উঁচু পাথরের উপর খোদাই করা ছবির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। তবে সেসব পাথরের খোদাই চিত্র অধিকাংশই যুদ্ধ, যুদ্ধবন্দী, নগর ধ্বংস ইত্যাদি। ভাস্কররা শিকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া হিংস্র জন্তুদের মূর্তি চমৎকার আঁকতে পারত। অনেক কাটা পাথর দেখে মনে হয় এরা পাথর কাটার কাজ জানত।

সুমের-এর ধাতুশিল্পীরা সোনা-রূপার কাজে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। উর-এর রাজপ্রাসাদে আবিষ্কৃত গহনাপত্রের মধ্যে সুন্দর সুন্দর নক্সার নেকলেস, ব্রেসলেট ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে ধাতুশিল্পীরা ঐ প্রাচীন কালেই কত নিপুণ ছিল। ধাতুশিল্পীরা বংশপরম্পরায় ছেলেদের ধাতুবিদ্যা শিক্ষা দিত। ধাতু-শিল্পীর বংশে জন্ম না হলে অন্যে এ শিল্পকাজ করতে পারত না।

চতুর্থ পাঠ

যানবাহন ও বাণিজ্য

মেসোপটেমিয়ার ঐশ্বর্য নির্ভর করত ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল—কাঠ, তামা, সোনা, রূপা কোন কিছুই এখানে পাওয়া যেত না। সেজন্য দূর দেশ থেকে ঐসব জিনিস মেসোপটেমিয়াতে আনতে হত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোভাবে চালাতে হলে উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্থলপথে মাল বহনের জন্য তাদের ছিল চাকার গাড়ি। নদী আর চওড়া খাল দিয়ে জলপথে পণ্য বহন করা হত। জলপথে পণ্য বহনের জন্য ব্যবহৃত হত কেলেক। কাঠ জুড়ে ভেলার

মতো বেঁধে হাওয়ায় ভরা চামড়ার খোলে ভাসিয়ে রাখা ভেলাকে বলে কেলেক।

বাণিজ্যের মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানী হত শিল্প ও কারিগরির নানা কাঁচামাল এবং গৃহস্থালীর নানা প্রয়োজনীয় আসবাব ও অন্যান্য জিনিস। নিজেদের দেশের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিনিময় করে সাধারণত সুমেরীয়রা পাথর, ভালো কাঠ, সোনা, রূপা ও অন্য ধাতু বিদেশ থেকে আমদানি করত। এখানকার কারিগরদের কাজের মান বজায় থাকছে কিনা তা দেখার জন্য নগর-রাষ্ট্র থেকে নিয়মিত তদারকের ব্যবস্থা ছিল। মিশর ও সিন্ধুপ্রদেশের সঙ্গে সুমেরীয়দের যে রীতিমতো বাণিজ্য চলত তার বহু প্রমাণ আছে।

কীলকাক্ষর

মেসোপটেমিয়ার লেখা অক্ষর প্রথমত আবিষ্কৃত হয় সুমের অঞ্চলে। এখানে প্রথমে চিত্রলিপির ব্যবহার ছিল। ক্রমে ক্রমে তারা চিত্রলিপির নানা উন্নতি করে বর্ণমালা আবিষ্কার করে। বর্ণমালার এক-একটি বর্ণ ও স্বরের চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বাঙলা ব্যাকরণে তোমরা বর্ণমালার কথা পড়েছ। সুমের-এর লিপির নাম **কীলকাক্ষর**। একটা ধারালো নরুনের মতো জিনিস দিয়ে শক্ত মাটির পাতের উপর সুমের লিপি লিখিত হয়। এ রকম মাটির পাতের উপর লেখা অসংখ্য বই মেসোপটেমিয়াতে আবিষ্কৃত হয়েছে। নিনেভে নগরে সম্রাট অসুরবানিপালের পাঠাগারে এরকম কয়েক হাজার বই ছিল।

সুমেরের দান

মেসোপটেমিয়ার পণ্ডিতরা বিজ্ঞানের চর্চায় অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যা জানতেন। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি

পর্যালোচনা করতেন। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় আগে থেকে বলতে পারতেন। বৎসরকে মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিটে ভাগ করার কৃতিত্ব তাঁদের। তাঁদের হিসাবের মূল ছিল ষাটের গুণিতক। রাশিচক্রের জ্ঞানও তাঁদের ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন মিশরের কাহিনী

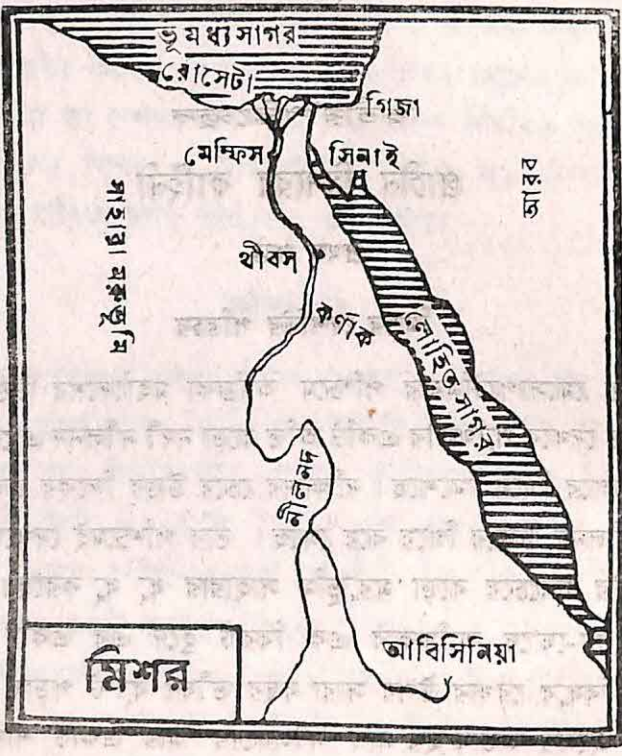
প্রথম পাঠ

মিশর দেশটির পরিচয়

মানচিত্রে মেসোপটেমিয়ার পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে দেখবে পৃথিবীর একটি অতি বড়ো নদী নীলনদ এঁকেবেঁকে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে মিশেছে। দক্ষিণের চেয়ে উত্তর দিকের ঢাল বেশি বলে নীলনদ উত্তরে গিয়ে বয়ে গেছে। তার পশ্চিমেই দেখতে পাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মরুভূমি সাহারার ধু ধু করছে। বিষুব রেখার গা-ঘেঁষে আফ্রিকার এক বিরাট হ্রদে এর একটি শাখার উদ্ভব। বিষুব রেখার উপর সারা বছর ভীষণ বৃষ্টি পড়ায় ঐ হ্রদে কখনো জলের অভাব হয় না। নীলনদের আর একটি শাখা নেমে এসেছে আবিসিনিয়ার পাহাড় থেকে। বর্ষায় ঐ পাহাড়ের বুকে বৃষ্টি নামলে নীলনদের এই শাখা বেয়ে সে জলের ধারা মিশরে বন্যা আনে। উৎসমুখে অনেক জলপ্রপাত থাকায় অনেক দূর পর্যন্ত নীলনদের উৎসের দিকে জলপথে যাওয়া যায় না। জলপ্রপাতের শেষে নীলনদ একটানা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। প্রাচীন মিশর হচ্ছে জলপ্রপাতগুলির নিচ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত

অঞ্চল। প্রতি বর্ষায় নিয়মিতভাবে নীলনদে বন্যা নামে। নীলনদের বন্যায় মিশরের এই অঞ্চল শস্যশ্যামল। নীলনদ না থাকলে সাহারা মরুভূমি মিশর দেশটিকে গ্রাস করে ফেলত।

বন্যার সময় নীলনদের স্রোতে জলজ লতাপাতা আর উর্বর পলিমাটি ভেসে আসে। জলজ লতাপাতার আভায় নদীটির স্রোত



নীলাভ দেখায় বলে এই নাম হয়েছে। নীলনদের উপরেই মিশরীয়দের জীবন নির্ভর করে বলে মিশরকে "নীলনদের দান" বলা হয়।

যেখানে বন্যার জল যেত না সেখানে ছিল মরুভূমি। আবার অন্যান্য অনেক স্থানে ছিল জলা। এসব জলাভূমি কালক্রমে পাপিরাস নামে এক রকম নলখাগড়ায় ভরে গেল। পাপিরাস বনে ছিল পাখির ঝাঁক আর নদীতে প্রচুর মাছ। উর্বর জমি, পাখি আর

মাছের লোভে বহু বহু যুগ আগে থেকেই এ অঞ্চলে মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়েছিল।

দ্বিতীয় পাঠ

ফেয়ারো

মিশরের সম্রাটকে ফেয়ারো বলে। ফেয়ারো কথাটির অর্থ হচ্ছে "বড়ো বাড়ির" লোক। যিনি বড়ো বাড়িতে থেকে দেশশাসন করেন তিনি হলেন সম্রাট। রাজপ্রাসাদ অন্য সব বাড়ির চেয়ে বড়োই হয়।

এই বড়ো বাড়িতে বসে ফেয়ারো দিনের সর্বক্ষণ নানা কাজকর্মে কাটান। রাজ্য পরিদর্শনে বের হলে ফেয়ারোকে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা নানা মহামূল্যবান উপহার পাঠাতেন।

মিশরের দাসদের মালিকদের রক্ষাকর্তা ছিলেন বলে ফেয়ারোর শক্তি দৃঢ় করার জন্যে পুরোহিতরা নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করতেন। ফেয়ারোদের তাঁরা দয়ালু ঈশ্বর বলে প্রচার করে ঘোষণা করতেন, যে তাঁর অবাধ্য হবে তার কঠোর শাস্তি হবে।

পুরোহিত

মিশরের দেবদেবীর পূজা ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চে স্থান ছিল পুরোহিতদের। যাদুমন্ত্র, পূজাপার্বণের বহু বিচিত্র অনুষ্ঠান জানতেন বলে তাঁদের মর্যাদা ছিল সমাজের সকলের উপরে। দেবমন্দিরে অর্থ ও উপহার দিতেন জনসাধারণ। বড়ো বড়ো মন্দিরে সে-সব উপহারের পরিমাণ ছিল খুব বেশি। এইসব উপহারের সম্পদ পুরোহিতদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া ছিল মন্দিরের জমির ফসলের আয়। মিশরের যত জ্ঞান-বিজ্ঞানের

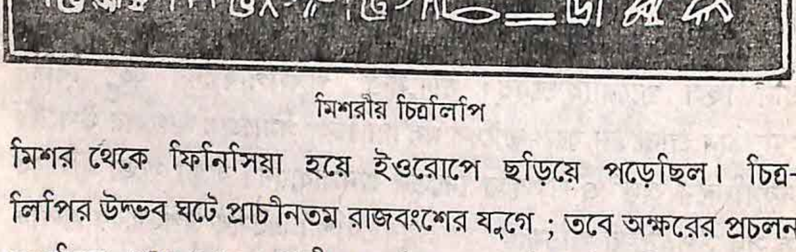
ভাণ্ডারের চাবিকাঠি ছিল পুরোহিতদের হাতে। তাঁরাই তরুণদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে গড়ে তুলতেন। তাঁরা সদাসর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরতেন। দিনে আর রাতে দু'বার করে তাঁরা স্নান করতেন। ধর্মজগতে তাঁরাই ছিলেন প্রধান।

দাস ও প্রভু

মেসোপটেমিয়ার মতো মিশরেও নবপ্রস্তর যুগের গোটা জীবনের সাম্যভাব লোপ পায়। তার বদলে অনেকের হাতে উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চিত হওয়ায় সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদ এল। আর যুদ্ধে পরাজিত বন্দীদের নিয়ে গঠিত হল দাসশ্রেণী। ধনীরা হলেন দাসদের প্রভু আর দাসরা তাদের অত্যাচারীদের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি করত।

লিপি

মিশরের প্রাচীনতম লিপি হল ছবির। যে জিনিস বোঝাতে হবে তার ছবি এ'কে দেখানো হত। তারপরে কল্পনাধর্মী চিত্র এ'কে মনের ভাব বোঝানো হত। এর পরে দেখা দিল চিত্রলিপি। তারও পরে বিভিন্ন বর্ণের উদ্ভব ঘটে। তখন মাত্র ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা



মিশরীয় চিত্রলিপি

মিশর থেকে ফিনিসিয়া হয়ে ইওরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। চিত্রলিপির উদ্ভব ঘটে প্রাচীনতম রাজবংশের যুগে ; তবে অক্ষরের প্রচলন হয়েছিল প্রায় ২৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। স্মৃতিসৌধগুলির দেয়ালে অবশ্য মিশরীয়গণ চিত্রলিপিরই ব্যবহার করতেন।

তৃতীয় পাঠ

কেরানী

মিশরের জটিল সমাজব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন, ধর্মকর্ম—সর্বক্ষেত্রে অনেক লেখালেখির দরকার হত। এসব লেখার কাজ করতেন কেরানীরা। মিশরের এক কেরানীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায়, তিনি জোড়াসনে বসে একটি কলম হাতে ও একটি কানে নিয়ে বসে কি যেন লিখছেন। কী কাজ কতটা হল, কত জিনিস দেওয়া হল, জিনিস-পত্রের দাম ও ব্যয়, লাভ-লোকসান—সব কিছুর হিসাব রাখার কাজ তাঁর। কত গবাদি পশু কসাইখানায় নেওয়া হল, কিংবা কি পরিমাণ শস্য বিক্রয় হল তার মাপজোখের হিসাবও তাঁকে রাখতে হত। ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তি ও লোকের শেষ ইচ্ছাপত্রও তিনি ছকে দিতেন। এইসব কেরানী প্রধানত যুক্ত থাকতেন মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে। তাঁদের আরও কাজ ছিল, নীলনদের জলের মাপ দেখে কখন বন্যা আসবে তা ঘোষণা করা, লোকগণনা ও আয়করের হিসাব রাখা। দেশের ব্যবসাবাণিজ্য, চাষবাসের হিসাব করে জানাতে হত পরের বৎসরে সম্রাটের কত রাজস্ব আদায় হবে। সরকারের কোন্ বিভাগে কত ব্যয় করতে হবে তারও নির্দেশ দিতেন তাঁরা।



কেরানী

রাজস্ব আদায়কারী

কেরানীদের কাজের তালিকা থেকেই দেখতে পাওয়া যায় সরকারের রাজস্বের কত সঠিক হিসাব। সরকার থেকে হিসেব রাখা হত কোন্ কৃষকের কতটা জমি, কত গবাদি পশু কত ফলের, আর কত আঙুরের গাছ আছে। সেই হিসাব মতো কৃষকদের কর দিতে হত। শস্য কি অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যের হিসেবে কর দেওয়া হত। সারা মিশরে এসব শস্য ও খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য বিরাট বিরাট গোলা ছিল। রাজদরবারের একদল করসংগ্রহকারী কর্মচারী ঘুরে ঘুরে সকলের কর আদায় করতেন। কেউ কর না দিলে কর্মচারীরা জোর করে তাদের ধরে উপরের কর্মচারীদের কাছে নিয়ে আসতেন। কারুর পক্ষে কর ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না।

সৈন্যবাহিনী

মিশরের প্রাচীন যুগে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। সেজন্য দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছিল। মিশরীরা নৌবাহিনীও গড়েছিল। কৃষকদের মধ্যে থেকে শক্তসমর্থ ব্যক্তিদের জোর করে ধরে নিয়ে সৈন্যবাহিনী গড়া হত। সেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্রাটগণ দিগ্বিজয়ে বের হতেন। দেশের কৃষক ছাড়া বিদেশের লোককেও মাইনে দিয়ে সম্রাটের সৈন্যদলে ভর্তি করা হত। এঁরা মিশরের দরিদ্র কৃষক ও দাসদের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করত। অর্থের লোভে যুদ্ধ করত বলে বিপদের সময় এদের উপর সম্রাটের খুব ভরসা থাকত না।

চতুর্থ পাঠ

ব্যবসাবাণিজ্য

মিশরের দাসপ্রভুদের জীবন ছিল বিলাসিতায় ভরা। সেজন্য দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর বিলাসসামগ্রীর আমদানি করতে হত। ধূপধুনো, সুগন্ধি তেল, রুপা, বাড়ি তৈরির উপযুক্ত ভালো কাঠ এবং

আরও নানা জিনিস, বহু দূর-দেশের দুর্গম পথঘাট অতিক্রম করে সে সব জিনিস আনতে হত। পথে নানা বিপদ-আপদের ভয় ছিল বলে সাধারণ মানুষ সে-সব জিনিস আমদানি করতে সাহস পেত না। সম্রাটের একচেটিয়া কারবার ছিল বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য। স্থলপথে মালবহন করা হত গাধায় টানা গাড়িতে। নীলনদ দিয়ে চলত জলপথে বাণিজ্য। নৌবহর নিয়ে যুদ্ধ ও বাণিজ্য দু-কাজই চালানো হত।

মিশরীয়রা সুন্দর পাথরের ফুলদানি বিদেশে চালান দিত। মেসোপটেমিয়ার লোকের মতো মিশরীয়রাও কাচের রঙিন জিনিসপত্র বানাত, তার বেশির ভাগ রপ্তানি হত।

সিন্ধুপ্রদেশেও মিশরের উৎকৃষ্ট আসবাবপত্র পাওয়া গিয়েছে। কাজেই মেসোপটেমিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও সিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে মিশরের যথেষ্ট বাণিজ্যিক লেনদেন হত।

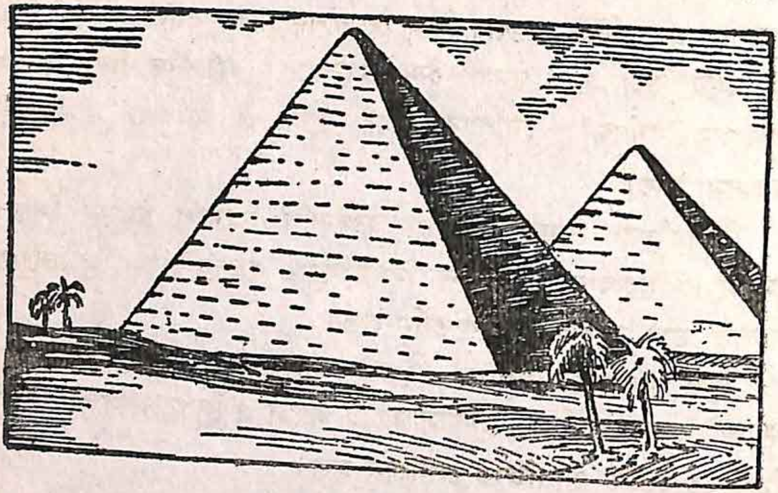
পৃথিবীর আশ্চর্য পিরামিড

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উভয় বিষয়েই প্রাচীন মিশরীয়রা অত্যন্ত উন্নত ছিল। স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পিরামিড। এটা পৃথিবীর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। অন্য উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হল স্ফিংস। আমাদের দেশের নৃসিংহ অবতারের মতো সিংহের শরীরে মানুষের মাথা বসিয়ে নির্মিত হয়েছে স্ফিংস। পিরামিডের সম্মুখে যেন এগুলো পাহারা দেয়।

পিরামিডগুলি কোন স্মৃতিস্তম্ভ নয়। এগুলি মিশরের সম্রাটদের সমাধিস্তূপ। পিরামিডগুলির মধ্যে সমাধিস্থ থাকে সম্রাটদের মমি। মমি হচ্ছে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে ফেলে ঔষধের মধ্যে রেখে দেওয়া সম্রাটদের শবদেহ।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পিরামিড হচ্ছে বর্তমান মিশরের রাজধানী কাইরোর কাছে গিজাতে খ্রীঃ পূঃ ২৬৫০ অব্দে প্রাচীন রাজত্বের সম্রাট ক্ষুপু-র সমাধির উপরে নির্মিত পিরামিডটি। প্রায় তিন লক্ষ

লোক কুড়ি বছর পরিশ্রম করে বিরাট বিরাট পাথর দিয়ে এটি নির্মাণ করেছে। একটা ঢালু পথের উপর দিয়ে পাথরগুলিকে কেটে টেনে নিয়ে যথাস্থানে সযত্নে বসানো হয়েছে। একাজে বিস্ময়কর



মিশরের পিরামিড

ইঞ্জিনীয়ারিং নৈপুণ্যের দরকার। সমাধিগুলির মধ্যে সম্রাটের ব্যবহারের সোনা-রূপার জিনিস, গহনাপত্র, খাটপালঙ্ক, অন্যান্য আসবাব সব রেখে দেওয়া হত। ১৯২০ সালে তুত আঙ্খ আমেনের সমাধি থেকে অবিশ্বাস্য ধনরত্ন ও আসবাবপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পিরামিডের দেওয়ালগুলিতে যুদ্ধবিগ্রহ, শিকার, পূজার বলিদান প্রভৃতির ছবি ও নানা চিত্রলিপি অঙ্কিত আছে।

পঞ্চম পাঠ

ধর্ম-বিশ্বাস

মিশরীয়দের জীবনের উপরে ধর্মের গভীর প্রভাব ছিল। প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা পরিচালনার পিছনে এক-একটি শক্তির অস্তিত্ব ছিল বলে মিশরীয়দের বিশ্বাস। যতদিন পশুশিকার মিশরীয়দের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা ছিল, ততদিন জীবজন্তু উপাসনাও তাদের মধ্যে

প্রচলিত ছিল। পরের যুগে কৃষিসমাজের প্রসারের সঙ্গে উত্তাপের দেবতা সূর্যদেবের পূজা আরম্ভ হল। লতাপাতা, মানুষ, জীবজন্তু সকলেরই প্রাণ নির্ভর করে সূর্যের আলোর উপর। সূর্যদেবতাকে সেজন্য সবচেয়ে প্রধান দেবতা করা হল। তাঁর নাম রা। দিনরাত্রি কেন হয় তার কারণ না জানায় মিশরীয়রা ভাবত যে সোনার নৌকায় রোজ সূর্যদেব (রা) আকাশের পূর্বপ্রান্তে উদয় হয়ে পশ্চিম প্রান্তে অস্ত যান। সূর্যদেব রা ছিলেন "দেবরাজ"। নীলনদের বন্যা প্রাণস্বরূপ ছিল বলে তারও পূজা করা হত। কৃষির দেবতা ছিলেন ওসিরিস। বন্যার পূর্বে কয়েকদিন ভীষণ শুষ্ক হাওয়া বইতে থাকে। তখন মিশরীয়রা ভাবত যে ওসিরিসের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বন্যার পরে তিনি আবার প্রাণ ফিরে পেতেন। প্রাণ ফিরে পাবার পর তিনি 'পরলোকের বিচারক' রূপে সকলের কাজের বিচার করতেন। পুণ্যবানদের তিনি নিজের রাজ্যে থাকতে দিতেন। পাপীদের দিতেন দূর করে।



ওসিরিস

মিশরীয়রা মৃত্যুর পরের জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। মানুষ মরে গেলে কবর দেওয়া হত। কবরের পূর্বে মস্তিষ্ক, পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে ওষুধ দিয়ে শরীর যাতে না পচে তার ব্যবস্থা করা হত। এরকমভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহকে মমি বলে। এমন মমি কলিকাতার যাদুঘরেও আছে। শুধুমাত্র সম্রাট ও অত্যন্ত ধনীদেরই মমি কবরে রক্ষিত হত।

ষষ্ঠ পাঠ

প্রধান প্রধান উপজীবিকা

তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করার ফলে মিশরীয়দের জলা-জঙ্গল-মরুভূমির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সহজ হয়েছিল। বন্যা প্রতিরোধের জন্য তারা নলখাগড়ার উপর কাদা লেপে একরকম বাঁধ তৈরি করে। তারা সমুদ্র ও নীলনদ থেকে অনেক খালও কেটেছিল। তাতে কৃষিকাজের উন্নতি হল।

কৃষকদের চাষবাসই ছিল মিশরের সর্বপ্রধান জীবিকা। সম্রাটের অধীনে সেচকাজের জন্যও নির্দিষ্ট একদল কর্মচারী ছিল। এদের মতো কর-আদায়কারী ও দাসদের সর্দাররাও ছিল রাজকর্মচারী। তাছাড়া, কেরানীদের পেশাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

মিশরের লোক কৃষিকাজের সঙ্গে গবাদি পশু চারণও করত। খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বছরে এই দুটি কাজই ছিল মিশরের লোকের প্রধান উপজীবিকা। লাঙল নির্মাণ ও অন্যান্য ধাতুদ্রব্য নির্মাণের জন্য বহু কারিগর নিযুক্ত হত। মিশরের কৃষকদের মধ্যে থেকে কারিগররা কাপড় বুনত, মাদুর বানাত ও মাটির বাসন তৈরি করত। পরে ধাতু আবিষ্কার হলে কয়েকজন দক্ষ শ্রমিক তামা ও অন্য ধাতুর কাজকর্ম করত। সাধারণত ধাতুশিল্প ছিল বংশপরম্পরার কাজ। অলঙ্কারের জন্য মিশরীয়রা সোনা-রূপার কাজও করত। ধাতু-শিল্পীরা ক্রমে ক্রমে চাষবাস ছেড়ে কামারের কাজেই ডুবে রইল। এইসব কারিগরের হস্তশিল্প ছিল মিশরীয়দের অন্য প্রধান উপজীবিকা।

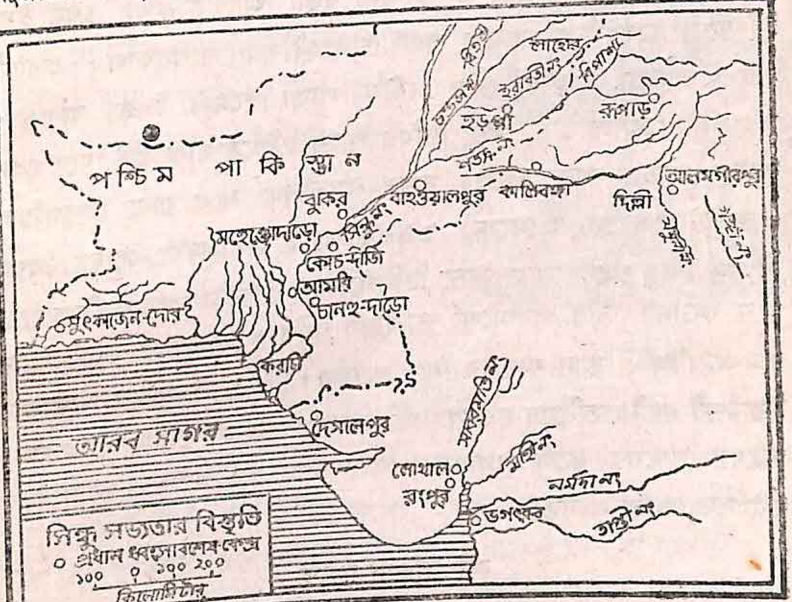
মেসোপটেমিয়ার লোকেরা পশমের কাপড় পরত আর মিশরের লোকদের পরিচ্ছদ ছিল সুতীবস্ত্র। মন্দির ও পিরামিডের গায়ে খোদাই করা ছবি থেকে মিশরীয়দের পোশাকের ধারণা পাওয়া যায়। মিশরে মধ্য-রাজত্বে কুমোরের চাকের চলন হয়। মিশরে ছুতোরদের কাজের ভীষণ চাহিদা ছিল। হাতির দাঁত আর পাথর বসিয়ে খুব সুন্দর আসবাবপত্র মিশরীয় কারিগররা বানাত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পাঠ

প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা

মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মতো ভারতেও অতি প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। পুরাতাত্ত্বিকগণ আবিষ্কার করেছেন যে লক্ষ লক্ষ বছর আগের পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে একটানা ভারতের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। মাদ্রাজের বিঙগলেপুট ও বিহারের মুঙ্গের জেলায় পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহারের সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া গেছে।



তারপর নবপ্রস্তর যুগের মাটির পাত্র, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে মহীশূরের ব্রহ্মগিরি, নর্মদা নদীর তীরে এবং গুজরাটের লাঙ্গনাহ নামক স্থানে। তারপর নবপ্রস্তর যুগের শেষে উন্নত কৃষিকাজ শিখে ভারতীয়গণ গ্রাম্য পরিবারের গোষ্ঠীজীবন

যাপন আরম্ভ করেন। সমস্ত ইরানীয় উপত্যকা ও তার দক্ষিণে সিন্ধু ও ঘর্ঘরা অববাহিকা অঞ্চল জুড়ে এ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

তারপর একদিন গ্রাম থেকে সে সভ্যতা দক্ষিণে সিন্ধুনদের তীরে আর উত্তরে ইরাবতী নদীর দু-ধারে গড়ে তুলল নগর। আর কালক্রমে সে নগর চাপা পড়ে গেল মাটির তলে। শুধু উঁচু উঁচু ঢিবি রইল এখানে সেখানে। আর তার চারিদিকে ছড়িয়ে রইল ভাঙা দালানকোঠার যত ইট।

আবিষ্কারের কাহিনী

সে আজ থেকে প্রায় সোয়া শো বছর আগের কথা তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব, লর্ড ডালহৌসির শাসনকাল। করাচী থেকে লাহোর পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হচ্ছে। সিন্ধু অঞ্চলের লারকানা জেলায় উঁচু উঁচু ঢিবির পাশে ছড়িয়ে থাকা ইট দিয়ে রেল লাইন পাতার কাজ চলল। তখন অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল এত ইট এল কোথা থেকে। ১৯২২ খ্রীঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে উঁচু ঢিবিগুলিকে প্রাচীন নগরের চিহ্ন বলে মনে করেন। তাঁর পরামর্শে ভারতের জরিপ বিভাগের কর্তা স্যার জন মার্শাল ঐ স্থান খননের নির্দেশ দেন। ঐ একই সময়ে পাঞ্জাবের ইরাবতী নদীর তীরের হরপ্পাতেও দয়ারাম সাহনী খননকার্য করেন। তাঁদের খননের ফলে যথাক্রমে আবিষ্কার হল মহেঞ্জোদড়ো আর হরপ্পার লুপ্ত সভ্যতা।

কী পাওয়া গেছে

মহেঞ্জোদড়ো শব্দটির অর্থ মৃতের স্তূপ। স্থানীয় লোকেরা ভাবতেই পারেন নি, তাঁদের পায়ের নিচেই রয়েছে ভারতের এমন এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন যা কিনা মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মতো প্রাচীন! খননকার্যের ফলে যেসব জিনিস পাওয়া গেছে তা থেকেই পণ্ডিতরা এই সভ্যতার চরিত্র ও প্রাচীনত্ব বুঝতে পেরেছেন।

বর্তমানে স্থান দুইটিই পাকিস্তানের অন্তর্গত। তবে পশ্চিমে **সুৎকাজনেদার** থেকে আরম্ভ করে মীরাটের কাছে **আলমগিরপুর,** পাঞ্জাবের **রূপার,** গুজরাটের **লোথাল** এবং রাজস্থানের **কালিবাঙগান** পর্যন্ত এ সভ্যতার স্থিতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তার সবচেয়ে বেশি।

খননকার্যের ফলে প্রথমে যা দেখা গেছে তা হল এক অপূর্ব পূর্ব-পরিকল্পিত নগরের অবস্থান। তারপর এখানে আবিষ্কৃত দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র থেকে জানা যায় যে, এটি ছিল এক অতি উন্নত নাগরিক সভ্যতা। সভ্যতার স্তর যে অতি উচ্চ ছিল তার প্রমাণ শিশুদের অসংখ্য খেলনা। তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম থেকে বোঝা যায় যে, সভ্যতাটি মেসোপটেমিয়া ও মিশরের প্রায় সমসাময়িক। কুমোরের চাকে তৈরি হরপ্পার অপূর্ব মাটির পাত্র মেসোপটেমিয়ার চেয়ে উন্নত শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। পোড়া ইটের দোতলা তিনতলা বাড়িও স্থাপত্যকীর্তির পরিচয় বহন করে। চিত্রলিপির ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য সীলমোহর থেকে। খনন-কাজের সময় পাওয়া সোনাদানা ও শঙ্খের নানা অলঙ্কার নাগরিকদের জীবনের উন্নত মানের পরিচয় দিচ্ছে। ব্রোঞ্জের অপূর্ব নর্তকী মূর্তি শিল্পকলার উন্নতির স্বাক্ষর। চাকার গাড়ি, কাঠের লাঙল প্রভৃতি নমুনাও সভ্যতার উচ্চমানের পরিচায়ক।



সীলমোহর

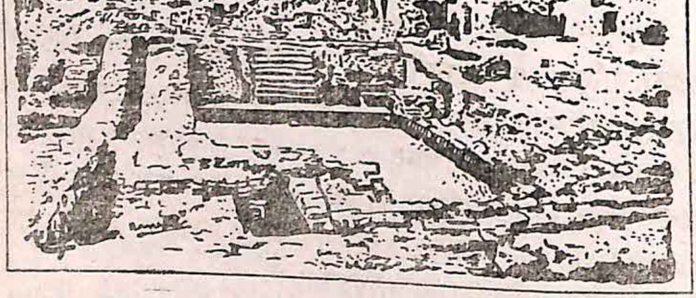
মহিষ, ষাঁড়, গণ্ডার, অ্যাণ্টিলোপ, বাঘ, হাতি প্রভৃতি জীবজন্তুর সীলমোহর দেখে মনে হয় কৃষির সঙ্গে পশুচারণও ছিল লোকের জীবিকা। ঐতিহাসিকদের মতে সিন্ধুসভ্যতা ছিল মিশর-মেসোপটেমিয়ার থেকে উন্নত।

দ্বিতীয় পাঠ

নগরবিন্যাস

সিন্ধুসভ্যতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নগরবিন্যাস। মহেঞ্জোদড়োর পথঘাট সমস্ত পূর্ব-পরিকল্পিত জ্যামিতিক ছকে নির্মিত। মহেঞ্জো-দড়োর পথঘাট ২০ হাত চওড়া ও ১৬০০ হাত লম্বা। রাস্তার দুধারে পোড়া ইটের একতলা দুতলা তিনতলা দালান। ইটগুলি সব এক মাপের। রাস্তা সব সোজা ও চওড়া। বাড়ির দরজা, সিঁড়ি, উঠান সবই আধুনিক ধরনের। প্রত্যেক বাড়িতে ছিল স্নানের ঘর, কুয়ো আর নোংরা জল নিষ্কাশনের জন্য ছিল রাস্তার দুপাশে ঢাকা পয়ঃপ্রণালী।

বিরাট একটি স্নানাগার আবিষ্কার হয়েছে মহেঞ্জোদড়োতে। একসঙ্গে বহু লোক এখানে স্নান করতে পারতেন। স্নানের পর



প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ—মহেঞ্জোদড়ো

পোশাক পরিবর্তনের জন্য জলাধারের তিন পাশে ছোট ছোট কুঠরি ছিল।

নগরের জল সরবরাহের জন্য অনেক ইঁদারা ছিল। সেখানে জল খেয়ে ফেলে দেওয়া অসংখ্য মাটির ভাঁড় দেখা যায়। সারা শহরে জল সরবরাহের দায়িত্ব ছিল পৌর কর্তৃপক্ষের। সদর রাস্তার উপরে একটু দূরেই জঞ্জাল ফেলার স্তূপ ছিল। নর্দমার মধ্যে মধ্যেও জঞ্জাল আটকানোর জন্য ঝাঁঝরি বসানো থাকত।

তৃতীয় পাঠ

সিন্ধুসভ্যতার খাদ্য

মহেঞ্জোদড়োর রান্নাঘরে খাবার রাখবার পাত্রে পাওয়া গেছে ,গম, যব, খেজুর, মাছের কাঁটা এবং পশুর হাড়। তা থেকে অনুমান হয় আমাদের পশ্চিম ভারতের মতো সেযুগেও প্রধান খাদ্য ছিল গম, যব ও খেজুর। আমিষ ও নিরামিষ দু-ধরনের খাদ্যই প্রচলিত ছিল। আমিষ খাদ্যের মধ্যে ছিল গোরু, ভেড়া, শূকর, ছাগল, হাঁস ইতাদি। তাছাড়া ছিল ডিম, দুধ ও টাটকা ফল আর শুঁটকী মাছ।

পরিচ্ছদ ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি

সিন্ধুসভ্যতার যুগের পুরুষ ও মহিলাদের পরিচ্ছদের পরিচয় পাওয়া যায় এখনকার মূর্তি ও ছবি থেকে। পুরুষরা কাপড় পরে গায়ে চাদর জড়াতেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই চুল বড় থাকত। পরিচ্ছদ ছিল তুলা ও পশমের। তার নাম ছিল সিন্ধু। মহিলাদের প্রিয় ছিল মেখলা। তারা উধর্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের জন্য দুপ্রস্থ কাপড় ব্যবহার করতেন। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ছিলেন অলঙ্কারপ্রিয়। হার, আংটি, কানের গহনা, বালা সকলেই পরতেন। মেয়েরা পায়ে দিতেন মল। সাধারণ ঘরের মেয়েরা পরতেন তামা কিংবা ব্রোঞ্জের গহনা। মেয়েদের কেশবিন্যাসের রীতিও ছিল এখনকার মতো।

মহেঞ্জোদড়োতে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য নানা জিনিস পাওয়া

গেছে। এ-সমস্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাছ ধরার বঁড়শি, হাতির দাঁতের চিরুনি, ক্ষুর, আয়না এবং চীনামাটি, ব্রোঞ্জ ও তামার বাসন-কোসন। হরপ্পার চিত্র-বিচিত্র মাটির পাত্র যে মেসোপটেমিয়া ও মিশরের চেয়ে ভালো ছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

এখানে পাওয়া খেলনা থেকে সিন্ধু সভ্যতার মান যে কত উঁচু তা জানা যায়। মাটির পাখি, ঝুনঝুনি, ছোটো ছোটো গাড়ি, চেয়ার, খাট, টুল ইত্যাদি খেলনা অনেক ছিল। চারুকলা আর সংগীতচর্চার প্রমাণ হচ্ছে ব্রোঞ্জের নর্তকমূর্তি। মনে হয়, এঁরা মন্দিরের দেবদাসী। হরপ্পার আবক্ষমূর্তিটি উন্নত ভাস্কর্যের পরিচয় দেয়।

চতুর্থ পাঠ

আর্থিক জীবন

কৃষি ও পশুপালন ভিন্ন কারুশিল্প ছিল সিন্ধু অঞ্চলের লোকের প্রধান উপজীবিকা। সেই পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা হত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে।

যে-সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সিন্ধু অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই জানা যায় যে, তখন কারিগরি ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। এ-যুগের কারিগরির সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার উৎপাদনের ধারার সঙ্গেও কিছু মিল আছে। তবে যন্ত্রপাতির ধরনধারণ ছিল পৃথক।


মৃৎশিল্প

সিন্ধু অঞ্চলে প্রচুর উৎকৃষ্ট তুলা পাওয়া যেত। এখানকার সুতীবস্ত্র মেসোপটেমিয়াতে রপ্তানি হত। এই দেশের কর্মীরা হাড়ের তকলি বা টাকুতে সুতা কাটতেন। তাঁরা শন কি পশমের জিনিস ব্যবহারের চেয়ে সুতীবস্ত্রই বেশি পছন্দ করতেন।

স্বর্ণকার, রৌপ্যকার, মৃৎশিল্পী, কুমোর প্রভৃতি সকলেই নিজ

নিজ কাজে অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। প্রায় আধুনিক যুগের মতোই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সিন্ধু অঞ্চলের কারিগররা তৈরি করতে পারতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। সমুদ্রপথে ব্যবসা চলত মিশরের সঙ্গে। মেসোপটেমিয়া, বেলুচিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য হত জলপথে। মেসোপটেমিয়ার একটি শহরে হরপ্পার অনেক সীলমোহর পাওয়া গেছে। তা থেকেই মনে হয়, এই দেশের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য হত। স্থানীয় লোকেরা উটের পিঠে চড়ে বাণিজ্যে যেতেন। ভারী জিনিস টানবার জন্যে ছিল বলদের গাড়ি। প্রাচীন নৌকাও আবিষ্কৃত হওয়ায় জলপথে বাণিজ্যের সাক্ষ্য বহন করে। সীলমোহরে নৌকার ছবি দেখেও জলপথে বাণিজ্যের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাপজোখের জন্য ভারী ও সোনা-রূপার জন্য ছোটো ছোটো অনেক বাটখারা এখানে পাওয়া গেছে। অসংখ্য সীলমোহর দেখে মনে হয় এগুলি বিভিন্ন ব্যবসায়ীর নিজের মালের উপর ছাপ মারবার জন্য ব্যবহার হত। সম্ভবত হরপ্পার ব্যবসায়ীরা মাটির পাত্র, শস্য, তুলাজাত দ্রব্য, মসলা, দামী পাথর, দামী পাথরের পুঁতি, মুক্তা, চোখের সুর্মা নিয়ে গিয়ে ধাতুদ্রব্য বিনিময় করে আনত।

এ অঞ্চলে খুব বেশি ধাতুর খনি ছিল না। তাই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু দেশের ভিতরের ও বাইরের দূর দেশ থেকে আমদানি করতে হত। রাজপুতানা ও বেলুচিস্তান থেকে তামা ও দক্ষিণ ভারত থেকে শঙ্খ আনা হত। ব্যবসায় লেনদেন করতে কি মুদ্রার ব্যবহার হত তা সঠিক জানা যায় নি।

পঞ্চম পাঠ

উপাসনা ও ধর্মাচরণ

অনেকের ধারণা সিন্ধু অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল পুরোহিততন্ত্র। তবে লক্ষ করার বিষয় এই যে, এখানে কোনও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায় নি। কিন্তু ইতস্তত নানা দেবীমূর্তি ও সীলমোহরে কয়েকটি দেবতার মূর্তি দেখা যায়। এরা গাছপালা, পাথর, ষাঁড়, কুমির, সাপ ইত্যাদির পূজা করতেন বলে মনে হয়। আজও আমাদের মধ্যে এসব পূজা চলে আসছে। অসংখ্য মাতৃকামূর্তি দেখে মনে হয় এখানকার চন্ডী, কালী, দুর্গার মতো সেযুগেও ধূপ-ধুনা দিয়ে মাতৃকাদেবীর পূজা হত। এখানকার অগণিত শিবলিঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে এখানে শিবপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কয়েকটি সীলে দেখা যায় যোগাসনে বসে আছেন এক শৃঙ্গধারী উপাসক। আর তাঁকে ঘিরে আছে জীবজন্তু। অনেকের ধারণা তিনি পশুপতি শিব।

মৃতদেহ সমাধিস্থ বা দাহ দুই-ই করা হত। শিশুদের শব সমাধিস্থ করাই ছিল রীতি।

সমাজে শ্রেণীভেদ

নবপ্রস্তর যুগের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সমাজে শ্রেণীভেদ এবং দাস-প্রথার উদ্ভব। মেসোপটেমিয়া ও মিশরে সে-প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভারতেও যে শ্রেণীভেদ ছিল তারও প্রমাণ আছে সিন্ধু অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষে।

নগরবিন্যাসের মধ্যেই দেখা গেছে যে ধনীরা দুর্গ মহলে বসবাস করতেন। দরিদ্র ও শ্রমিক এবং দাসদের বাসস্থান ছিল নগরের বাহিরের ছোটো ছোটো খুপরিতে। বাড়িগুলির মধ্যেও শ্রেণীভেদের ছাপ পড়েছে। পাকা ইটের গাঁথনির দোতলা, তিনতলা বাড়ির পাশেই কাঁচা গাঁথনির সারি সারি ছোটো বাড়ি দরিদ্রের বসতি বলেই মনে হয়।

সিন্ধুসভ্যতার গুরুত্ব ও ধ্বংসের কারণ

কালক্রমে ভারতের প্রাচীনতম সিন্ধু-সভ্যতাও একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে এ সভ্যতার প্রভাব পরবর্তী কালের ভারতের সভ্যতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব এতে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে একটানা তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ পর্যন্ত ইতিহাস জানা গেছে। তৃতীয়ত, আধুনিক ভারতের বহু ধর্মানুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা সেই যুগ থেকে চলে আসছে। চতুর্থত, সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে মিশর-মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সম্পর্ক থেকে জানা গেছে যে, ভারত সে যুগেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।

এই সভ্যতা যে কী করে ধ্বংস হল তার কারণ আজও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাচীনের প্রাচীন কাহিনী

প্রথম পাঠ

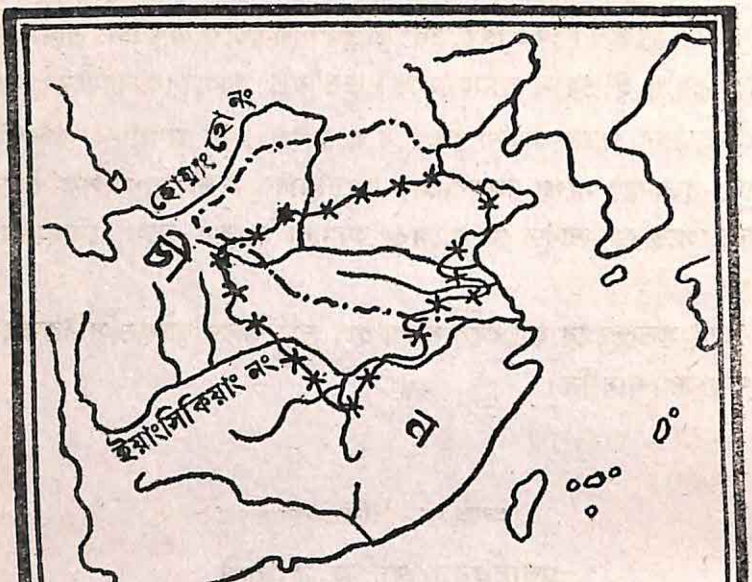
হোয়াং-হো-ইয়াং-সিকিয়াং অববাহিকা

হিমালয়ের ওপারে এশিয়ার এক বিশাল অংশ জুড়ে মহাচীন। এখানকার সভ্যতা অনেক প্রাচীন। আর পৃথিবীর বহু জিনিসই আবিষ্কার করেছেন চীনের জনগণ। মনে আছে তো তিন লক্ষ বছর আগের আগুন আবিষ্কারের কথা!

ইয়াং-সিকিয়াং অববাহিকা: চীনের প্রাচীনতম সভ্যতার উদ্ভব অন্য দেশের মতো কোনও শান্ত নদীর উর্বর অববাহিকায় ঘটেনি। মধ্য ও দক্ষিণ চীনের অনেকটা জায়গা জুড়ে ইয়াং-সিকিয়াং নদীর অববাহিকা যেমন উর্বর, তেমনি বসবাসের উপযোগী। এ অঞ্চলের

জলহাওয়া মৃদু হলেও আদিম মানুষ এখানকার সহজ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।

হোয়াং-হো অববাহিকাঃ চীনে সভ্যতার বিকাশ ঘটে হোয়াং-হো বা পীত নদীর তীরে চীনের উত্তর অঞ্চলে। চীনের উত্তর-পূর্বের



প্রাচীন চীনের সভ্যতা

পাহাড় অঞ্চল থেকে হোয়াং-হোর উৎপত্তি হওয়ায় পলি মাটির জন্যে জলের রঙ হলুদ দেখায়। তাই ঐ নাম। হোয়াং-হোকে চীনের লোকেরা দুঃখের নদী বলেন। তার কারণ, মিশরের নীলনদের মতো প্রতি বৎসর এই নদীতেও বন্যা নামে আর তীরের বসতি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তবে বন্যার জল সরে গেলে পলিমাটিতে সমস্ত অববাহিকার মাটি উর্বর হয় আর সহজেই শস্য জন্মায়।তাই খ্রীঃপূঃ ২০০০ অব্দে পীত নদীর পূর্বাংশের মাঝামাঝি ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার উদ্ভব হয়। ব্রোঞ্জ-যুগের মানুষের সকল কৃতিত্বই স্থানীয় চীনের অধিবাসীদের ছিল।

তাঁরা নগর সভ্যতার পত্তন করেন। এবং লেখনপদ্ধতিও আয়ত্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ

প্রাচীন চীনের সমাজজীবন

চীনের ব্রোঞ্জযুগের ইতিহাস শাংযুগের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। এটাই চীনের প্রথম রাজবংশ। তাঁর নাম হল **শাং** বা **ইন্**। এঁদের রাজধানী আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। রাজধানীর ধ্বংসস্তূপকে লোকে বলে **ইন্-এর স্তূপ**। এই স্তূপ খনন করে সেযুগের জিনিসপত্তর থেকে ব্রোঞ্জযুগের চীনের জীবনযাত্রার একটি ধারণা করা হয়েছে।

শাংযুগের রাজ্য হোয়াংহো অববাহিকার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যজুড়ে অভিজাত জমিদারদের প্রাধান্য ছিল। শাং রাজারা প্রধান পুরোহিতদের কাজ করতেন। তখন যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। দু-চাকার যুদ্ধের রথের তখনই প্রচলন হয়েছিল।

এ-যুগের পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক। জমি ও পশুর পূজাই ছিল প্রাচীন কালের ধর্ম। রেশমগুটির চাষ, লেখনপদ্ধতির বিকাশ, ব্রোঞ্জের অপূর্ব পাত্র ও অন্যান্য শিল্পকার্য এ-যুগের উন্নত সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

এ-যুগের মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। তবে কৃষি-পদ্ধতি ছিল আদিম। তাঁদের লাঙল ছিল না। তাঁদের প্রধান খাদ্য ছিল গম ও যব। সেখানে ধানের চাষও হত। শাং যুগে কুকুর, শূকর, ছাগল, ভেড়া, গোরু, ঘোড়া ইত্যাদিকে পোষ মানানো হয়েছিল। এ যুগের কারিগররা ব্রোঞ্জ, পাথর, হাড়, ঝিনুকের খোল, শিং প্রভৃতি দিয়ে চমৎকার জিনিস বানাতে পারতেন। এঁরা মাটির দেওয়াল দেওয়া দোতলা ঘর বানাতে জানতেন।

শাং বংশের পরে চৌ রাজবংশ দীর্ঘকাল চীনে রাজত্ব করেছিল। তখন থেকেই চীনের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়।

তৃতীয় পাঠ

কিংবদন্তির দেশ

প্রাচীন চীনকে কিংবদন্তির দেশ বলা চলে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পৃথিবীর সৃষ্টির কথা।

চীনের প্রথম মানুষ পান কু। তিনি ১৮০০০ বছর ধরে এই পৃথিবী রচনা করেন। নিঃশ্বাস থেকে তিনি বাতাস ও মেঘ এবং অস্থি থেকে যত খনিজ পদার্থ, মাংস থেকে মাটি, চুল থেকে গাছপালা, শিরা-উপশিরা থেকে নদ-নদী আর উকুন থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম রাজা। তারপর শুরু হয় তের ভাইয়ের রাজত্ব। এঁরা ছিলেন **স্বর্গীয় সম্রাট।**



পান কু

লিপির কিংবদন্তিঃ চীনের লিপির উদ্ভব সম্বন্ধেও এক কিংবদন্তি আছে। ইন্-এর স্তূপের চারিপাশে ছড়ানো ছিল কচ্ছপের খোলা। কচ্ছপকে দেবতার অংশ বলে মনে করা হত। কেউ ভবিষ্যৎ জানতে এলে পুরোহিতরা কচ্ছপের খোলা আগুনে ফেলে দিতেন। খোলাটি আগুনে ফেটে চৌচির হয়ে গেলে সেই ফাটা দাগে নাকি দৈববাণী ফুটে উঠত। পরবর্তী কালে কচ্ছপের খোলার উপরে চীনের লিপি লেখা হত।

পাঁচ রাজার উপকথাঃ চীন কিভাবে সভ্য হয়ে উঠল সে বিষয়েও এক কাহিনী আছে। পাঁচ রাজা ছিলেন চীনে। তাঁদেরই একজন আকাশের গ্রহনক্ষত্রের আলো দেখে আগুন আবিষ্কার করেন। আর একজন শেখান শিকার ও পশুপালন। আর একজন আবিষ্কার করেন চুম্বক। তারপর যিনি রাজা হলেন, তিনি বনবাদাড় কেটে সাফ করে যত জন্তু-জানোয়ার তাড়িয়ে মানুষের জীবন নিরাপদ করেন। তিনিই নদীর জল আটকে বন্যা রোধ করে কৃষির অনেক উন্নতি করেছিলেন।

বন্যার কিংবদন্তিঃ একটি কিংবদন্তিতে চীনের এক ভয়াবহ বন্যার কাহিনী বিবৃত আছে। একবার দিনের পর দিন বৃষ্টিতে সারা দেশ ডুবে গেল। ভেসে রইল শুধু পাহাড়ের চূড়াগুলো। লোকজন সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। দশ বছর ধরে সে বন্যা কমল না। তখন ঈ-ই নামে একজন লোক দিনরাত কাজ করে খাল কাটতে লাগল আর নদীগুলিকে আরও গভীর করার চেষ্টা করল। অবশেষে ঈ-ই-র চেষ্টা সফল হল। নদীর জল নেমে গেলে লোকজন আবার সমভূমিতে নেমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করলেন। কিংবদন্তি থেকে মানুষের পরিশ্রমের মূল্য বোঝা যায়।

প্রাচীন চীনে খরা ও বন্যা থামানোর জন্য ভগবানের কাছে দাসদের বলি দেবার প্রথা ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নদীতীরের সভ্যতার সাধারণ চরিত্র

প্রথম পাঠ

সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীতে যত সভ্য জীবনের পরিচয় আমরা পাই তার সবই অতীতের সুমের, মিশর, সিন্ধু ও চীন—এই চারটি নদীতীরের সভ্যতার নিকট ঋণী। এবং আজকের সভ্য জীবনধারার সূত্রপাতও

ঐসব সভ্যতা থেকে। নথিবদ্ধ ইতিহাসের আরম্ভও হয়েছে তখন থেকেই। আর ঐসব সভ্যতা মানবজীবনে উন্নতির একটি বিশিষ্ট অধ্যায় নির্দেশ করছে।

নদীতীরের সভ্যতাগুলির বিকাশের ক্ষেত্র ও পরিবেশ স্বতন্ত্র। বিভিন্ন পরিবেশে গড়ে উঠেছে বলে সভ্যতাগুলির প্রত্যেকটির চরিত্র হয়েছে অনন্য। কিন্তু যত বিভিন্নই হোক না কেন, তাদের সেই বিবিধের মধ্যেও এক মহান মিলনসূত্র খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। এসব সভ্যতার প্রত্যেকের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ চরিত্র দেখা যায়।

নগর ও রাষ্ট্রঃ সভ্যতা মাত্রেরই একটা বিশিষ্ট চরিত্র হচ্ছে নগর-জীবন ও রাষ্ট্রের কাঠামোর উদ্ভব। এই চারটি সভ্যতার সব ক'টির মধ্যেই তা দেখা যায়। গ্রাম থেকে কিভাবে নগর সৃষ্টি হল তা আগেই বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের কাঠামোরও বিকাশ ঘটেছে নগরের জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। রাষ্ট্র কাকে বলে জান? যখন কোনও লোকজন একটা সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বসবাস করেন আর তাঁদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনকানুন রচনা ও সেই আইনকানুন ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোককে মানাবার মতো কোন সরকার থাকে তখন ঐ অঞ্চলকে রাষ্ট্র বলা হয়।

মানবসমাজ উন্নতির একটা বিশেষ ধাপে না পৌঁছনো পর্যন্ত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না। সুমের, মিশর, সিন্ধু, চীন সর্বত্রই রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটেছে এমনি করে। রাষ্ট্রে থাকেন রাজা আর তাঁর আদেশ পালনের জন্য অসংখ্য কর্মচারী। রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীও থাকে। এঁদের কাজ হল প্রজাদের রাজার আদেশ পালনে বাধ্য করা আর যুদ্ধ বিগ্রহে যোগ দেওয়া। প্রস্তরযুগ থেকে ধাতুর যুগে নতুন আর ভালো ভালো অস্ত্রশস্ত্র হওয়ায় শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা যেমন সহজ হল তেমনি সহজ হল দিগ্বিজয়।

শ্রেণীভেদঃ নদীতীরের সভ্যতাগুলির আর একটি সাধারণ চরিত্র হল সমাজে শ্রেণীভেদ—ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য। আদিম যুগের

গোষ্ঠীজীবনের সাম্যবাদ তখন লোপ পায়। ধনী-দরিদ্র ভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অধিকারও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সরকারের আইনও বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ছিল বিভিন্ন ধরনের।

জ্ঞানচর্চা ও লিপিঃ ঐসব সভ্যতাগুলিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগের চর্চা হত। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল।

তাছাড়া ছিল লিপির প্রচলন। লিপি আবিষ্কারের ফলেই আজ আমাদের পক্ষে ঐসব সভ্যতার বিবরণ জানা সম্ভব হচ্ছে।

দ্বিতীয় পাঠ

সাধারণ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণঃ সভ্যতার অগ্রগতির পথে নগরের বিকাশের সঙ্গে সমাজে বেশি বেশি উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন আরম্ভ হয়েছিল। তার সঙ্গেই ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দেখা দিয়েছিল। সে কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে।

ধীরে ধীরে সমাজে কারিগর, কামার, কুমার, ছুতার ইত্যাদি লোকের নানা বৃত্তি দেখা দিল। এ থেকে এসেছিল শ্রমবিভাগ। তারপর শ্রমবিভাগ থেকে উদ্ভব হয়েছিল বিশেষীকরণের। এই দুই প্রক্রিয়ার উদ্ভবের ফলে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের উৎপাদনের মাত্রা আগের যুগের তুলনায় অনেকগুণ বেশি হয়েছিল। সব ক'টি সভ্যতার ক্ষেত্রেই এভাবে শ্রমবিভাগ ও কাজের **বিশেষীকরণ** ঘটতে দেখা গিয়েছে।

ব্যবসাবাণিজ্যঃ প্রথমে বাড়তি ফসল উৎপাদন, তার পরে বিনিময় এবং বিনিময়ের পরিণতি হিসাবে বাণিজ্য দেখা দিয়েছে সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে। যন্ত্রপাতি ও কারিগরির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা বাড়ে। সে অভাব পূরণের জন্যেই সুমের, মিশর, সিন্ধু, চীন অঞ্চলের সঙ্গে এত বাণিজ্য হত।

ব্যবসাবাণিজ্য চলত জল ও স্থল উভয় পথেই। বাণিজ্যের উপযুক্ত বড়ো বড়ো নৌকা ও গাড়ি এ সব ক'টি সভ্যতাতেই দেখা গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য হিসেব আর ওজনের প্রয়োজনীয় বাটখারাও সর্বত্র ছিল।

বাণিজ্যিক লেনদেন থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তাধারারও বিনিময় ঘটেছে।

অনুশীলনী

প্রবন্ধ ধরনের প্রশ্ন : (১) মেসোপটেমিয়ায় দাস ও প্রভুশ্রেণীর উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল, তার বিবরণ দাও। (২) মেসোপটেমিয়ার লোক কিভাবে বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা করত তার বিষয় যা জান লেখ। (৩) মিনার, কাঁচা ইটের মন্দির, ফেস্কো এসব কাদের কৃতিত্ব? এসব বিষয়ে তাদের কৃতিত্বের পরিচয় দাও। (৪) মিশরের সম্রাটের মৃত্যুর পরে শবদেহ কিভাবে সৎকার করা হত? এ-বিষয়ে পৃথিবীর একটি আশ্চর্য জিনিসের বিশদ বিবরণ দাও। (৫) মিশরের অধিবাসীদের প্রধান প্রধান উপজীবিকা কী ছিল? (৬) সিন্ধুসভ্যতার অঞ্চলে খননকার্যের ফলে কী কী ব্যবহারের জিনিস পাওয়া গেছে? (৭) মহেঞ্জোদড়োর নগর-পরিকল্পনার পরিচয় লিপিবদ্ধ কর। এ থেকে সমাজের শ্রেণীভেদের কী প্রমাণ পাওয়া যায়? (৮) সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে কাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত? সে বাণিজ্যের মালপত্র চেনার উপায় কী ছিল? (৯) মহাচীনের প্রাচীন জীবনের প্রমাণ কী থেকে পাওয়া গেছে? তার বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (১০) নদীমাতৃক সভ্যতাগুলির সামাজিক বৈশিষ্ট্য কী ছিল? (১১) ঐ সব আদি সভ্যতার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য কী?

মৌখিক প্রশ্ন : (১) মেসোপটেমিয়ার প্রথম সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল? (২) কীলকাক্ষর কাকে বলে? (৩) মিশর দেশটিকে কেন নীলনদের দান বলা হয়? (৪) মিশরে অক্ষরের প্রচলন হয়েছিল কখন? (৫) পিরামিড কী? (৬) মিশরের দুই-একজন দেবতার নাম কর। (৭) বর্তমান ভারতের কোথায় কোথায় সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আছে? (৮) মহেঞ্জোদড়োতে লোকের আমোদ-প্রমোদ বলতে কী ছিল? (৯) চীনের সভ্যতা প্রথম গড়ে উঠেছিল কোথায়? (১০) চীনের ব্রোঞ্জযুগের আরম্ভ কোন্ রাজবংশ থেকে?

বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন ঃ নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থানে পাশে দেওয়া ব্র্যাকেটের মধ্যে শুদ্ধ শব্দ দিয়ে পূর্ণ কর ঃ (১) মেসোপটেমিয়ার অবস্থান টাইগ্রিস ও —নদীর মাঝখানে (নীলনদ/ইউফ্রেটিস)। (২) মেসোপটেমিয়াতে —কে জীবনবৃক্ষ বলা হত (খেজুর/জলপাই)। (৩) ফেয়ারো ছিলেন মিশরের— (সম্রাট / প্রধান পুরোহিত)। (৪) মহেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ — (ধ্বংসস্তূপ/মৃতের নগরী)। (৫) চীনের সাং যুগের পরিবার ছিল —(মাতৃতান্ত্রিক/পিতৃতান্ত্রিক)।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

লৌহযুগের সমাজ

প্রথম পাঠ

লোহা আবিষ্কার ও তার ফলাফল

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সমাজে শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদন অনেক বেড়েছিল। তথাপি এ-যুগের শেষ অবস্থায় সমাজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে প্রয়োজনের তুলনায় কি খাদ্য, কি জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণ কোনটাই লোকসংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট ছিল না। তাই তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সমাজে অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায় ও গভীর সংকট দেখা দেয়। নবপ্রস্তর যুগের বিপ্লবের ফলে যেমন তামার আবিষ্কার হয়ে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ আরম্ভ হয়েছিল তেমনি এবার লোহা আবিষ্কার হয়ে নতুন লৌহযুগের সভ্যতা সৃষ্টি হয়।

লোহার কথা প্রথম জানা যায় প্রায় ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তবে তখনো মানুষ ভালো করে আকরিক লৌহ খনিজ থেকে লোহা গলাবার কৌশল জানতেন না। সে কৌশল মানুষ শেখেন ১৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে।

যে-অঞ্চলে তামা প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল তারই কাছে এশিয়া মাইনরের হিট্টাইট জাতি প্রথম লোহা গলাবার কৌশল শিখেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরান এবং গ্রীসে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। ভারতে লৌহযুগের আরম্ভ হয়েছিল প্রায় ১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে।

লোহা তামার চেয়ে সহজলভ্য ও সস্তা আর কঠিন। তাই দ্রুত-গতিতে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই লোহার প্রচলন ঘটে।

ফলাফল : লোহার আবিষ্কার হওয়ায় এ যুগের মানুষের জীবনে নানা পরিবর্তন এল। বন কেটে বসতি বাড়িয়ে বাড়তি লোকসংখ্যার খাদ্য জোগানোর ব্যবস্থা হল। লোহার ব্যয় অল্প বলে আগের তুলনায় অনেক লোক লোহার যন্ত্রপাতি দিয়ে কারিগরি আরম্ভ করলেন। সমাজের সর্বস্তরে উৎপাদনের মাত্রা অনেক বেড়ে গেল।

দ্বিতীয় পাঠ

লৌহসমাজের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক বৈশিষ্ট্য : তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের মতো লৌহযুগের সমাজেও কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। লোহার কুড়ালের সাহায্যে বন কেটে বসতি বাড়ানো হল। ভারতের লৌহযুগের প্রথম দিকে সভ্যতা খুব উন্নত ছিল না। আর্যরা লোহার কুড়াল দিয়ে বন কেটে গঙ্গা-যমুনা অববাহিকায় বসতি বিস্তার করেছিলেন। লোহা ব্যবহার করে সারা দেশে অনেক ছোটো বড়ো নগর গড়ে উঠল। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতে কয়েকটি বড়ো বড়ো নগরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেসব বড়ো বড়ো নগরের নাম মহাজনপদ। অন্যত্রও এমন অনেক নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এ-যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণমালার আবিষ্কার। আর চিত্র-লিপি নয়—রীতিমতো শব্দ অনুসারে বর্ণমালার লিপি এখন প্রায়

সর্বত্র প্রবর্তিত হয়। তাতে লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটল। ভারতের আর্যরা খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দেই আর্যভাষার লিপির প্রচলন করেছিলেন।

আর্থিক বৈশিষ্ট্যঃ লোহা আবিষ্কারের ফলে সমাজে আরও অনেক বৃত্তির উদ্ভব হল। লাঙগলে লোহার ফলা লাগিয়ে গভীরভাবে মাটি চাষ করায় খাদ্য বৃদ্ধি হল। বন কেটে চাষের সীমা বাড়ানো হল। দাসদের দিয়ে এইসব বন কাটানো হত, আর তাদের সেই নতুন চাষের জমিতে কিছু কিছু অধিকারও দেওয়া হল। লোহা দিয়ে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি বানানো হয়। এ ধরনের বহু হাতুড়ি, কামারের নেহাই, চিমটে, পেরেক, বাটালি প্রভৃতি মাটির নিচে পাওয়া গিয়েছে।

আর্থিক জীবনেও পরিবর্তন দেখা দিল। আগে জিনিসপত্র সরাসরি বিনিময় হত। এখন মুদ্রার মাধ্যমে জিনিসপত্র কেনাবেচা আরম্ভ হল। প্রথম মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল গ্রীসের লিভিয়া প্রদেশে। তারপর সেখান থেকে অন্যান্য দেশে মুদ্রার প্রচলন ঘটেছিল।

রাজার রাজ্যবিস্তারঃ লৌহযুগে যখন নানা অঞ্চলে বহু বড়ো বড়ো নগর প্রতিষ্ঠিত হল তখন তাদের জন্য শাসনকাঠামোও রচিত হল। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই রাজার রাজত্ব দেখা দিল। আগের যুগের মানুষের শাসন বা সাধারণতন্ত্রের সংখ্যা কমে এল।

তৃতীয় পাঠ

বাবিলনের লৌহযুগ

প্রাচীন ইতিহাসঃ মেসোপটেমিয়ার গল্প বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে সুমেরের অনেক উত্তরে আক্কাদ বলে একটি অঞ্চল ছিল। মিশরের সম্রাট মেনেস্-এর মতো সম্রাট সারগনস সুমের জয় করে আক্কাদ ও সুমের-কে মিলিয়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়েছিলেন। তিনি **বাবিলন**

নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাবিলন কথাটির অর্থ **দেবতার মন্দির।** বাবিলন দীর্ঘকাল এ রাজ্যের রাজধানী ছিল। বাবিলনের সুখ ও সমৃদ্ধির সীমা পরিসীমা ছিল না। খ্রীঃপূঃ ২০০০ **অব্দে** এই রাজ্যের আর এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন **হাম্মুরাবি।** তিনি ছিলেন একাধারে দিগ্বিজয়ী এবং সুশাসক। তিনি সমগ্র মেসোপটেমিয়া, উত্তরের পাহাড় অঞ্চলের আসিরিয়া প্রভৃতি জয় করে বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা ছিল পূর্বে **এলাম** থেকে পশ্চিমে **ভূমধ্যসাগর** পর্যন্ত।

পরবর্তী কালে আসিরীয় জাতি বাবিলন দখল করে নিয়েছিলেন। ঐ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন **অসুরবানিপাল।** তাঁর একটি বিরাট পাঠাগার পাওয়া গেছে। আসিরীয়দের পরে আবার কলডিয়াবাসীরা বাবিলন জয় করে নব বাবিলন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন **নেবুকাদ্‌নেজার।**

কৃষি ও বাণিজ্যঃ বাবিলনের উন্নতির মূলে ছিল কৃষি এবং বাণিজ্য। এই রাজ্যের জমির অধিকাংশই দাস বা প্রজাদের দিয়ে চাষ করানো হত। বাবিলনীয়রা উন্নত ধরনের লাঙল দিয়ে চাষ করত। এখানে এক প্রাচীন ছবিতে দেখা যায় যে, বলদে লাঙল টানছে আর পিছন থেকে একজন লোক চোঙায় করে চষা জমিতে বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছেন। বন্যার জল যাতে জমির ক্ষতি না করে তার জন্য চাষের জমির চারিধারে উঁচু আল তৈরি করা হত। চাষের জন্য জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল। সেজন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের খালগুলিকে ব্যবহার করা হত।

পশ্চিম-এশিয়া থেকে মিশর কি ভূমধ্যসাগরে যাবার পথে পড়ত বাবিলন। ফলে বাবিলন হয়ে উঠেছিল সমগ্র পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য-কেন্দ্র। পূর্বে ইরান, ভারত থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে মিশর ভূমধ্য-সাগরের নানা দেশের বণিকরা এখানে ব্যবসা করতেন। ভারতের সঙ্গে তুলাজাত বস্ত্রের ব্যবসা হত। আর পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে চলত

মৃৎপাত্রের কারবার। তাছাড়া দামী পাথর কাটা, তামার কারুকাজ, সেলাইয়ের কাজেও ব্যাবিলনীয়দের খুব সুনাম ছিল। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হয়। তখন এ'রা সমাজের অন্য ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনমতো টাকা ধার দিয়ে সুদ আদায় করতেন। জল ও স্থল উভয় পথেই ব্যাবিলনের বাণিজ্য চলত।

চতুর্থ পাঠ

মন্দির পুরোহিততন্ত্র ও সংস্কৃতি

মন্দির ঃ ব্যাবিলনীয়গণের মনে প্রবল ধর্মবিশ্বাস ছিল। তাঁরা নানা দেবতার পূজা করতেন। প্রত্যেক নগরের এক-একজন দেবতা ছিলেন। এসময় দেবতাদের পূজা-অর্চনার জন্য সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হত। মন্দিরের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল পুরোহিতদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তিও ততই বাড়তে লাগল।

ব্যাবিলনের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এগুলো অনেক উঁচু—দুতলা, তিনতলা দালান হত। তাতে উঠতে হত ঘোরানো পথে। এই ধরনের মন্দিরকে বলে **জিগুরাট** বা **স্বর্গের পাহাড়**। নগর দেবতার বিরাট জিগুরাট ছাড়াও ঘরে ঘরে গৃহদেবতার মন্দির ছিল। ঐসব মন্দিরে মাটির প্রতিমা গড়ে পূজা করা হত। সূর্যদেবতা সামাস-এর উপাসনা করেই হাম্মুরাবি তাঁর বিধান লাভ করেছিলেন।

পুরোহিততন্ত্র ঃ ব্যাবিলনের অধিবাসীরা যে কর দিতেন তা আদায় করা হত নগরদেবতার নামে। সে-কর মন্দিরের কোষাগারেই জমা হত। তার ফলে ঐসব মন্দিরের পুরোহিতের ধনসম্পদ এবং প্রতিপত্তি দুই-ই বৃদ্ধি পায়। পুরোহিতরা রাজাদের সিংহাসনে অভিষেক না করা পর্যন্ত দেশবাসী রাজাকে তেমন মর্যাদা দিতেন না। কর ছাড়াও

ভক্তদের দানও ছিল মন্দিরের আয়। সেজন্য পুরুষানুক্রমে মন্দিরের সম্পত্তি বেড়ে যেত। পুরোহিতরা মন্দিরের ধনসম্পদ খাটিয়ে নিজেরা বড়ো বড়ো জমিদার, কারিগরি পণ্যদ্রব্যের বড়ো ব্যবসাদার এবং ধনী মহাজনে পরিণত হলেন।

বাবিলনের নগরদেবতা ছিলেন মারদুক। তাঁর মন্দিরই ছিল সবচেয়ে বড়ো আর তাঁরই পুরোহিত ছিলেন দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিঃ বাবিলনীয়দের শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত্তি ছিল পূর্বের সুমেরীয় সভ্যতা। এখানকার ধর্মমন্দিরগুলিই ছিল শিক্ষা-কেন্দ্র। ঐসব মন্দিরে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। এখানকার গণনার একক ছিল ৬০। আমরা যে ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট বা ৬০ মিনিটে এক ঘন্টা ইত্যাদি বলি তা বাবিলনের সংস্কৃতি থেকেই লাভ করেছি। এদেশের পন্ডিতেরা ভগ্নাংশের অঙ্ক আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তী কালে গ্রীকরা বাবিলনের কাছ থেকেই জ্যোতি-র্বিদ্যা শিখেছিলেন। জিগুরাটগুলি ছিল বাবিলনের প্রেক্ষনাগার। বাবিলনে সাহিত্যের অনেক উন্নতি হয়েছিল **গিলগামেশ** নামে প্রাচীন মহাকাব্য এদেশের কবিরই রচিত। মন্দিরের দেওয়াল ছবি এঁকে সাজানো হত। আর এখানে উপাসনার সময় গানবাজনা হত। এদেরও লিপি ছিল কীলকাকৃতি।

পঞ্চম পাঠ

হাম্মুরাবির বিধান

হাম্মুরাবি ছিলেন বাবিলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি দেশ শাসনের জন্য কর্মচারীদের সদাসর্বদাই নানা নির্দেশ পাঠাতেন। তেমন অসংখ্য নির্দেশ খননকার্যের ফলে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। বাবিলনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল একটি পাথরে

খোদাই-করা ছবি। ছবিতে দেখা যায় সম্রাট হাম্মুরাবি স্বর্গদেবতা সামাস-এর সম্মুখে প্রার্থনা করছেন। তার নিচে খোদাই-করা আছে দেবতার কাছ থেকে লাভ করা আইন বা বিধান।



হাম্মুরাবির বিধানলাভ

হাম্মুরাবির এই বিধান-গুলি বাবিলনের মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য রচিত। বিধানগুলি থেকে সে-যুগের বাবিলনের সমাজ-জীবনের নানা বিষয় জানা যায়।

তাঁর বিধানেই প্রথম জানা যায় যে রাজার কাছে ন্যায়বিচারের অধিকার প্রজার আছে। সেটা রাজার অনুগ্রহ নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, জমির অধিকার, মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ, মেয়েদের অধিকার এমন নানা ভাগে সে-বিধান বিভক্ত। চিকিৎসককে যে দর্শনী দিতে হবে, শ্রমিকদের মজুরি দিতে হবে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার এই সবও আছে হাম্মুরাবির বিধানে।

সমাজচিত্র : হাম্মুরাবির বিধানে যে সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে দেখা যায় যে বাবিলনের সমাজে প্রধানত ধনী, অভিজাত, মধ্য-বিত্ত আর দাসশ্রেণীর লোক ছিলেন। জমিদার আর রাজকর্মচারীরা ছিলেন অভিজাত, আর সাধারণ ব্যবসায়ী ও অন্যেরা ছিলেন মধ্য-বিত্ত। তবে সকলের চেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল দাসশ্রেণীর। এই বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য শাস্তি, জরিমানা ইত্যাদির আইনও ছিল বিভিন্ন। একই অপরাধে অভিজাতদের শাস্তি হত কম। সমাজে বহুবিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ চলত। স্ত্রী-স্বাধীনতারও প্রচলন ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা মন্দিরে দেবদাসী হতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পাঠ

মিশরের সাম্রাজ্যিক অভ্যুদয়

সাম্রাজ্যিক অভ্যুদয়ঃ পিরামিডের যুগের মিশরের গৌরব ছিল যে ফেয়ারোদের তাঁদের রাজবংশের কালকে বলা হত প্রথম রাজত্ব। তাঁরা নুবিয়া, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, সিনাই প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে মিশরের রাজভাণ্ডার ভরিয়ে তোলেন। তাঁদের পরে মধ্য রাজত্বের সময় মিশরের দিগ্বিজয়ী অভিযান তেমন ঘটেনি। শেষের দিকের দুর্বল রাজশক্তিকে হিকশাস জাতি পরাজিত করে মিশরে সাময়িকভাবে হিকশাস কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। ক্রমে ক্রমে এদের বিরুদ্ধে দেশে বিক্ষোভ জমে উঠলে সম্রাট **প্রথম আহমোদ** বিদেশীদের বিতাড়িত করে এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের কাল নতুন রাজত্ব নামে পরিচিত।

নতুন রাজত্বের আমলে আবার শুরু হয়েছিল দিগ্বিজয়ী অভিযান। মিশরের নতুন সামরিক শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফেয়ারো **তৃতীয় থুটমোস**। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ কর্ম-নিপুণ সেনাপতি। তাঁর রাজত্ব-কালে তিনি ১৭ বার দিগ্বিজয়ী অভিযান করেছিলেন। তিনি প্যালেস্টাইন, লিবিয়া ও নুবিয়া জয় করেন। তাঁর বিশাল রণতরী-বাহিনী নিয়ে তিনি টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস থেকে নীলনদের সুদূর দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তার করেন। এবার আর লুণ্ঠন নয়—রীতিমতো অধীনস্থ উপনিবেশে পরিণত হল বিজিত



তৃতীয় থুটমোস

রাজ্যগুলি। উপনিবেশের লোকদের মিশরের ফেয়ারোকে নিয়মিত কর দিতে হত; নয়তো বিপুল পরিমাণ শস্য ও গবাদি পশু সরবরাহ করতে হত। মিশরের প্রভুদের প্রয়োজন মতো কারিগরি জিনিসপত্রও উপনিবেশ থেকে আনা হত।

মিশরের উপনিবেশঃ নতুন রাজত্বের যুগে বিজিত উপনিবেশ-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফিনিসিয়া, ক্যানান, হিট্টাইটদের দেশ, আসিরিয়া, লেবানন এবং নুবিয়া প্রভৃতি দেশ। এদেশের অধিবাসীরা হয় তাদের প্রত্যক্ষ অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন নয়তো তাঁদের দাবি মেনে নিয়ে কর প্রদান করতেন। উপনিবেশগুলি থেকে প্রচুর সম্পদ ও শস্য মিশরের রাজভান্ডারে জমা হত। তাছাড়া অসংখ্য যুদ্ধবন্দী, দাস ও খাদ্যও মিশরে চালান আসত। প্রকৃতপক্ষে এইসব দাস-শ্রমেই মিশরের সম্পদ সৃষ্টি হতে লাগল।

এসব উপনিবেশকে মিশরের শোষণযন্ত্রের অঙ্গ বিশেষ মনে করা ঠিক নয়। মিশরের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, মিশরের অভিজাত দাস প্রভুদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে উপনিবেশগুলির নানা বিষয়ে উন্নতি হল। কালক্রমে ফিনিসিয়া, গ্রীস প্রভৃতি উপনিবেশগুলি নতুন বিশ্ব-সভ্যতার নতুন নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় পাঠ

পুরোহিতদের ক্ষমতা

নূতন রাজত্বে বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে যত ধনসম্পদ রাজধানীতে আসত তার একটি বড় অংশ যেত মন্দির ও পুরোহিতদের কোষাগারে। নতুন রাজত্বের রাজধানী থীবস্-এ নগর দেবতা আমন-রা-এর মন্দিরকে লেবাননের একটা বড়ো অংশ ও তিনটি শহরের সকল রাজস্ব দান করা হয়।

এইভাবে মন্দির ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ধনসম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য শাসনের ব্যাপারেও তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। একটি

উদাহরণ থেকে সে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে। থীবস্-এর আমন-রা-এর মন্দিরের দাসের, প্রজা ও ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দেশের আর সমস্ত মন্দিরের মিলিত সম্পদের চেয়ে বেশী। থীবসের পুরোহিতরা এসবের জন্য এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন যে ফেয়ারোর অধিকারেও হস্তক্ষেপ করতে ইতস্তত বোধ করেন নি।

ক্ষমতা দখলের চেষ্টাঃ পুরোহিতদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে শক্তিশালী **সম্রাট আমেন হোটেপ** এক নতুন ধর্মসংস্কার করেন। দেশের অসংখ্য দেবদেবীর পূজার পরিবর্তে তিনি একমাত্র সূর্যদেবতা অ্যাটনের পূজা প্রবর্তন করেন। সারা দেশে তখন নতুন করে অ্যাটন দেবের মন্দির নির্মিত হতে থাকে। সম্রাটও আমেন হোটেপ নামের পরিবর্তে ইখনাটন বা অ্যাটনের প্রিয় এই নাম গ্রহণ করেন।

কিন্তু তাঁর সে-চেষ্টা সফল হয়নি। তাঁর সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর সমস্ত সংস্কার বাতিল হয়। পুরোহিততন্ত্র এরপর আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় রামেশেসের রাজত্বকালে মন্দিরের ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পায় এবং পুরোহিততন্ত্র প্রায় একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এখন থেকে পুরোহিতপদ রাজবংশের মতো বংশপরম্পরাগত হয়ে ওঠে।

পুরোহিততন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির আরও কারণ ছিল। প্রথমত মিশরের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি সমস্ত কিছুরই কর্তৃত্ব ছিল তাঁদের হাতে। ঐযুগে লোকের মনে নানা কুসংস্কার ও যাদুবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ জন্মায়, লোকে পুরোহিতদের ভয় পেতেন। দ্বিতীয়ত, পুরোহিতরা নিজেদের বিপুল সম্পত্তি ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষিকাজে খাটাতেন। তাঁদের আরও এক কাজ ছিল অপরকে টাকা ধার দিয়ে সুদ আদায় করা। এইসব কারণে তাঁদের ক্ষমতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে নতুন রাজত্বের শেষদিকে তাঁদেরই পরামর্শে সম্রাটের নির্দেশগুলি রচিত হত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ইরানের সভ্যতা

প্রথম পাঠ

পারস্যের অভ্যুদয়

বর্তমান পাকিস্তানের পশ্চিমে, আফগানিস্তানের দক্ষিণে পাহাড় মাল-ভূমি আর মরুভূমিতে-ভরা দেশ ইরান।

ভারতের আর্যদের একটি শাখা পশ্চিম ইরানে প্রায় ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে প্রবেশ করেছিলেন। মিডিয়া অঞ্চলে তাঁদের বাস ছিল। আসিরিয়ার রাজা মিডিয়া জয় করেছিলেন। কিন্তু মিডিয়াবাসীরা মেসোপটেমিয়ার কলডীয় জাতিদের সঙ্গে মিলে আসিরীয়দের হাত থেকে মুক্তি অর্জন করেছিলেন।

মিডিয়া রাজ্য ক্রমে ক্রমে প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল। মিডিয়াবাসীদের অধীনে ছিল আর একটি আর্যজাতির শাখার লোক। তারা ফারসী বলে পরিচিত। ফারসীদের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষার সম্পর্ক ছিল। এদের নাম থেকেই দেশটির নাম হয়েছিল পারস্য।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ফারসীরা পারস্য উপসাগরের পূর্ব উপকূলে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছিল। বিভিন্ন ধাতুর কারিগরি ও দেশের ভিতরে গম, যব ইত্যাদির চাষ ও পশুপালন করে ফারসীরা ক্রমেই শক্তি অর্জন করতে থাকেন।

মহান কাইরাসঃ ৫৫৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দে কাইরাস দক্ষিণ ফারসী দলের রাজা হন। পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি সমস্ত পারসিক জাতির শাসনকর্তা হয়ে ওঠেন। তারপর মিডিয়া যখন কলডীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন ফারসীরা কাইরাসের নেতৃত্বে মিডিয়া জয় করেছিলেন। এর পর বহু অভিযান চালিয়ে কাইরাস এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মেসোপটেমিয়ার চারিপাশের প্রায় সকল দেশই কাইরাসের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এরপর তিনি ৫৩৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দে

ব্যাবিলন জয় করেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র কলডীয় সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের পূর্ব দিকে তিনি সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত জয় করেছিলেন। মিশর বিজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি ফিনিসিয়া ও প্যালেস্টাইন জয় করেছিলেন। তবে মিশর জয়ের স্বপ্ন তাঁর সফল হয়নি।

সে স্বপ্ন সফল করেছিলেন তাঁর ছেলে ক্যাম্বিসের। তিনি মিশর জয় করে পারস্যকে বিশ্বশক্তিতে পরিণত করেন। তবে তাঁর কুশাসনে সাম্রাজ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং তিনি নিহত হন।

মহান প্রথম দারিয়ুসঃ পারস্য সাম্রাজ্যে যখন বিদ্রোহ দেখা দেয় তখন অভিজাত শ্রেণীর এক অপূর্ব শক্তিশালী ব্যক্তি সে বিদ্রোহ দমন করে সম্রাট হন। ইতিহাসে তিনি প্রথম দারিয়ুস বা মহান দারিয়ুস নামে পরিচিত।

তিনি পারস্যের সাম্রাজ্যসীমা আরও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধ। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরের বহু অঞ্চলে ছিল গ্রীক উপনিবেশ। এ'রা এবং গ্রীসের প্রধান নগর-রাষ্ট্র এথেন্স বিদ্রোহীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। তাই দারিয়ুস একে একে এসব অঞ্চল জয় করে এথেন্স আক্রমণ করেছিলেন। পারসিক নৌ-বাহিনী ম্যারাথন সমভূমিতে অবতরণ করলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে দারিয়ুসের নৌ-বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে যায়।

ইতিপূর্বে তিনি তাঁর বিজয়কাহিনী অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্যে বাহিস্তান পর্বতের উপর খুব উঁচুতে শিলালিপি রচনা করেছিলেন। দারিয়ুসের রাজধানী **পার্সিপোলিস** সে-যুগের পৃথিবীতে অতুলনীয় রাজধানী ছিল।

গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই দারিয়ুসের মৃত্যু হয়। তারপর জারেক্সেজ নৌকার সেতু রচনা করে দার্দানেলিস প্রণালী অতিক্রম করে গ্রীস আক্রমণ করেছিলেন। তিনি এথেন্স জয় করে

নগরটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দেন। কিন্তু **সালামিস**-এর নৌ-যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তারপর আর কোনও পারস্য-রাজ গ্রীসে অভিযান করতে পারেন নি। বরঞ্চ এরপর গ্রীকরাই এ আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন পারস্য জয় করে।

দ্বিতীয় পাঠ

জরাথুস্ট্রের বাণী

ইরানে বিভিন্ন প্রকার ধর্মের প্রচলন ছিল। তবে এ-সবের মধ্যে প্রধান ছিল জরাথুস্ট্র-প্রবর্তিত ধর্ম। প্রবর্তকের নাম থেকেই ধর্মটির নাম হয়েছে জরাথুস্ট্রবাদ। জরাথুস্ট্র নিজে কোনও নূতন ধর্ম প্রচারের দাবি করেন নি। তিনি প্রাচীন ইরানীয় ধর্মের মধ্যে শুধু একেশ্বরবাদই প্রচার করেছিলেন। সেই সঙ্গে প্রাচীন ধর্মের অনেক সংস্কারও করেছিলেন।

জরাথুস্ট্রের জন্মের সময় সঠিক জানা যায় নি। তবে পণ্ডিতদের ধারণা তিনি খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে জন্মেছিলেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা হল এই যে, পৃথিবীতে মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দুই শক্তি বর্তমান। এদের মধ্যে সর্বদাই কঠোর সংগ্রাম চলছে। সারা বিশ্বপ্রকৃতি ও পৃথিবীর সমস্ত জীবজগতের মধ্যেও এই দুই শক্তির সংগ্রাম চলছে। ঈশ্বর **আহুর মাজদা** হলেন মঙ্গলের ও আলোকের দেবতা। আর **আহ্রিমন** হলেন অমঙ্গলের ও অন্ধকারের দেবতা। এই দুই দেবতার মধ্যে সংগ্রামের শেষে যেদিন আহুর মাজদার জয় হবে সেদিন পৃথিবীতে হবে মঙ্গলের জয় ; পৃথিবী হবে ধর্মরাজ্যে পরিণত।

এই সংগ্রামে মানুষেরও অংশ আছে। আহুর মাজদার জয়লাভে সাহায্য করার জন্যে মানুষকে নানা গুণের অধিকারী হতে হবে। শেষ পর্যন্ত আলোকের ও মঙ্গলের দেবতা আহুর মাজদা অন্ধকারের ও অমঙ্গলের দেবতা আহ্রিমনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবেনই। জয়লাভের পর সমস্ত মৃতদের বাঁচিয়ে সৎ ও ধার্মিকদের স্বার্থে অসৎ ব্যক্তিদের নরকে পাঠানো হবে।

জরাথুষ্ট্রবাদ নৈতিক ধর্ম। এই ধর্ম অনুসারে সৎ কাজে পুণ্য ও অসৎ কাজে পাপ হয়। আলোকের প্রতীক সূর্য ও অগ্নির পূজা করেন জরাথুষ্ট্রবাদীরা।

জরাথুষ্ট্রের বাণী সংকলিত আছে **জেন্দ আবেস্তা** গ্রন্থে। এটাই পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ। ভারতের পার্সীরা ইরানের জরাথুষ্ট্রের ধর্ম পালন করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভ্রাম্যমাণ ইহুদী

প্রথম পাঠ

মিশরের হিব্রুরা

এবার হিব্রুদের সভ্যতার কথা। ইহুদীদের পরে হিব্রু বলা হয়। এঁরা ছিলেন পশ্চিম এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। পণ্ডিতদের মতে এঁদের আদি বাসস্থান আরবের মরুভূমি। তবে এঁদের পূর্ব-পুরুষদের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়াতে। সেখানে ১৮০০ খ্রীঃ-পূর্বাব্দের দিকে ইহুদীরা আদি পূর্বপুরুষ আব্রাহামের নেতৃত্বে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরে তাঁর পৌত্র জেকবের নেতৃত্বে একদল আরও পশ্চিমে গিয়ে প্যালেস্টাইন আক্রমণ করেন। প্রাচীন প্যালেস্টাইন ছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূল জুড়ে লেবানন পাহাড় থেকে আরব মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। জেকব-এর অপর নাম ছিল ইস্রায়েল। সেজন্য এই জাতিকে ইস্রায়েল বলা হয়।

১৬০০ খ্রীঃ-পূর্বাব্দের দিকে এ অঞ্চলে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে ইহুদীরা সবাই আরও পশ্চিমে মিশর রাজ্যে আশ্রয় নিলেন। কিছুকাল মিশরে ইহুদের জীবন সুখেই কাটল। কঠোর পরিশ্রম করে তাঁরা প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হলেন। তাঁদের ঐশ্বর্য দেখে তখন ফেয়ারোর ঈর্ষা হল। তিনি তাদের দাসে পরিণত করেন। রাজ্যের

যত কঠিন কাজ তিনি এঁদের দিয়ে করাতে লাগলেন—পিরামিড আর মন্দির নির্মাণের হাড়ভাঙা খাটুনি তাঁদের খাটতে হত।

ফেয়ারোর এ ব্যবহার অসহ্য হলেও এতে প্রকারান্তরে ইহুদীদের উপকারই হল। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হলেন। তাছাড়া তাঁদের নিষ্ঠুর প্রভুদের অত্যাচার যতই মর্মান্তিক হোক না কেন, এদের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইহুদীরা কৃষিকাজ শিখলেন। সেই সঙ্গে শিখলেন নানা কারিগরি, আইনশৃঙ্খলার গুরুত্ব ও নিয়মানুবর্তিতা।

ক্রমে ক্রমে ফেয়ারোর নিষ্ঠুরতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন যে ইহুদীদের পরিবারে ছেলে হলেই তাকে মেরে ফেলতে হবে। এ অত্যাচার অবশেষে সকলের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তখন ইহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে এলেন **মোজেজ**। ইনিই ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ অবতার।

দ্বিতীয় পাঠ

ইহুদীদের মুক্তি অভিযান

এঁর কাহিনীও রোমাঞ্চকর। ফেয়ারোর আদেশ অগ্রাহ্য করে মোজেজের মা তাকে তিন মাস লুকিয়ে রেখেছিলেন তারপর একদিন একটা ঝুড়িতে করে তাকে নীলনদের নলখাগড়ার ঝোপে রেখে দেন। ফেয়ারোর আদরের কন্যা স্নান করতে এসে তাকে দেখে প্রাসাদে নিয়ে যান। মোজেজ সেখানেই বড়ো হন। কিন্তু বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন ইহুদীদের দুর্দশা। একজন মিশরীয়কে হত্যা করে তিনি পালিয়ে যান। কিন্তু পথে দৈবাদেশ পান যে তাঁকে ইহুদীদের মুক্তি দিতে হবে। সেই আদেশ শুনে তিনি ফিরে গিয়ে সমস্ত ইহুদীদের নিয়ে গোপনে মিশর ত্যাগ করলেন।



মোজেজ

ফেয়ারোর সৈন্যদল চললেন তাঁদের ধরতে। সম্মুখে লোহিত সাগর। ইহুদীরা ভয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঈশ্বর তাঁদের সমুদ্রের মধ্য দিয়ে পথ করে দিলেন, আর ফেয়ারোর সৈন্যদল ডুবে মরলেন সমুদ্রের মধ্যে।

সিনাই উপদ্বীপের এ-পারে এসে মোজেজ আবার দৈববাণী লাভ করলেন। এবার তিনি লাভ করলেন দশটি বাণী। ঐ দশটি বাণীই ইহুদীদের ধর্মের ভিত্তি। ঐ বাণীর মূল কথা হল একমাত্র ভগবান হচ্ছেন জিহোভা। অন্য কোন দেবতার পূজা করা চলবে না। তাছাড়া আরও নানা উপদেশ ছিল তাতে। জিহোভার উপাসনাকে কেন্দ্র করে মোজেজ বিভিন্ন ইহুদীগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। হাম্মুরাবির বিধানের মতো মোজেজও ইহুদীদের কর্তব্য কাজের ও আইনের এক বিধান দিয়েছিলেন। তা-ই ইহুদীদের আইনের ভিত্তি। এঁরা তারপর প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাজ্য গড়েন। সে রাজ্যের রাজধানী হয় জেরুজালেম।

দুর্ভাগ্য ইহুদীদের নিত্যসঙ্গী ছিল। তাই মুক্তিলাভের পর প্যালেস্টাইন থেকে তাঁদের আবার বন্দী করেন বাবিলনের সম্রাট। পরে মহান কাইরাস তাঁদের মুক্তি দেন। কিন্তু পরে আবার রোমান সম্রাটগণ তাঁদের পরাজিত করে তাদের সঙ্গে এত নিষ্ঠুর আচরণ করেন যে ইহুদীরা পৃথিবীর নানা স্থানে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

ইহুদীদের দ্বিতীয় রাজা ডেভিড ও অন্য রাজা সলোমোন ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তি।

অনুশীলনী

প্রবন্ধধরণের প্রশ্ন ঃ

১। লোহা আবিষ্কার ও তার ফলাফল সম্বন্ধে যা জান লিখ।

২। লৌহসমাজের সামাজিক ও আর্থিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে একটি সুন্দর নিবন্ধ রচনা কর।

৩। প্রাচীন ইতিহাস থেকে বাবিলনের কৃষি ও বাণিজ্যের বিষয় যা জানা যায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। হাম্মুরাবি কে? তার বিধান বলতে কি বুঝায়? সে বিধানের মূল কথাগুলি লিখে ঐ সমাজের পরিচয় দাও।

৫। মিশরের সামাজিক দায়িত্ব প্রধানতঃ কার? এই যুগের মিশরের পুরোহিতদের ক্ষমতার পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

৬। পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের কয়েকটি যুদ্ধের ইতিহাস ও তার ফলাফল সংক্ষেপে লিখ।

৭। জরাথুস্ত্রের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৮। মিশরের হিব্রু কারা? এদের সম্বন্ধে যা জান বর্ণনা কর।

৯। ইহুদীদের রোমাঞ্চকর মুক্তি অভিযানের কাহিনী বর্ণনা কর। এই অভিযানের নেতা কে ছিলেন?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। বাবিলনের দেবতাদের মন্দিরকে কি বলে? সে কথাটার অর্থ কি? কথাটি কেন বলা হয়?

২। মিশরের কোন সম্রাট পুরোহিতদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করেন? তার পূর্বের ও পরের সম্রাটদের নাম কি?

৩। গ্রীসের সঙ্গে কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জারেক্সেজ দেশে ফিরে আসেন?

৪। জরাথুস্ত্রের মতে মঙ্গলের দেবতার নাম কি?

৫। মিশরের দাসত্ব থেকে হিব্রুদের কে মুক্তি দেয়? দেশে ফিরিবার সময় একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। সেটা কি?

বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন ঃ

[হ্যাঁ কি না '√' কিংবা '×' চিহ্ন দিয়ে দেখাও]

১। লোহার ব্যবহার প্রথমে ভারতে হয়েছিল……

২। হাম্মুরাবি বাবিলনের সম্রাট ছিলেন……

৩। জরাথুস্ত্র মিশরের অধিবাসী ছিলেন……

৪। প্যালেস্টাইনের রাজধানীর নাম জেরুজালেম……

৫। জেন্দ্ আবেস্তা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ……

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পাঠ

সভ্যতার পাদপীঠ গ্রীস

গ্রীক সভ্যতা অতীতে সমস্ত পৃথিবীকেই চমকিয়ে দিয়েছিল। শুধু অতীতই নয়, আজও গ্রীক সভ্যতার আসন পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে। অথচ এই গ্রীক সভ্যতা এক অতি সংকীর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রীকদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। ঐতিহাসিকরা একথা ভেবেই অবাক হয়েছেন যে কি-করে এত অল্পসংখ্যক লোকের সৃষ্টি আজও সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ হয়ে আছে।



ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বলকান উপদ্বীপের সবচেয়ে দক্ষিণে গ্রীস গিয়ে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রধান ভূখণ্ড ছাড়িয়ে ঈজীয় সাগরের বুকে আর একটি ছোট্ট দ্বীপের নাম ক্রীট।

গ্রীসের সভ্যতা নানাভাবে ক্রীটের কাছে ঋণী। ক্রীটবাসীদের

সভ্যতার আরম্ভ প্রায় ৫০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। এঁরা ধাতুর মিশ্রণ জানতেন; চমৎকার উন্নত নগর নির্মাণ করতে পারতেন। তিন রকমের লিপিও আবিষ্কার করেছিলেন। তাছাড়া তারা ছিলেন দুধর্ষ সমুদ্র-গামী জাতি। ভূমধ্যসাগরের উপকূলের প্রায় সব দেশের সঙ্গেই এদের ব্যবসাবাণিজ্য চলত।

বলকান অঞ্চল থেকে অ্যাকিয়ান নামে আর্যজাতির এক শাখা মধ্য গ্রীসের অ্যাটিকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁরাই কালক্রমে ক্রীট দখল করে নিয়েছিলেন। ক্রীট দখল করে তাঁরা ক্রীটের কাছ থেকে তাদের সভ্যতার সব কিছু জেনে নিলেন। শিখলেন সমুদ্রযাত্রা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা অঙ্গ। তারই ফলে গ্রীক হয়ে উঠল সভ্যতায় সংস্কৃতিতে অজেয়।

হোমারের গ্রীস

গ্রীসের আদিযুগের ইতিহাস দুভাগে বিভক্ত। প্রথমে গিয়েছে অ্যাকিয়ান যুগ—যখন অ্যাকিয়ানদের হাতে ক্রীটের পরাজয় ঘটে-ছিল। এদেরই চেষ্টায় গ্রীসের ওপর প্রাচীন ক্রীটের সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল; এরপর বলকান অঞ্চলের ডোরিয়ান নামে আর্যদের আর একটি শাখা অ্যাকিয়ানদের অধিকৃত অঞ্চল এবং ক্রীট জয় করেছিল। এদের যুগে সভ্যতার প্রসার ঘটেনি বলে তাকে অন্ধকার যুগ বলা হয়।

এই যুগেই উদয় হয়েছিল মহাকবি হোমারের। তাঁর রচিত দুই গ্রন্থ **ইলিয়াড** ও **ওডেসীতে** ঐ যুগের গ্রীসের সমাজ ও সভ্যতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

ইলিয়াডঃ ট্রয়ের একটি নাম ছিল ইলিয়াম্। সেজন্য ট্রয় নিয়ে রচিত মহাকাব্যের নাম দেওয়া হয়েছিল ইলিয়াড। ট্রয়ের রাজা গ্রীসের এক রানী হেলেনকে হরণ করে নিয়ে গেলে গ্রীকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে দশবছর ট্রয় অবরোধ করে রেখেছিলেন। তারপর বিখ্যাত কাঠের ঘোড়ার কৌশলে তাঁরা ট্রয় জয় করেন। ট্রয় বিজয়ের কাহিনীই ইলিয়াডের বিষয়বস্তু।

ওডেসী ঃ ট্রয় থেকে গ্রীক সেনাপতি ওডেসীয়ুসের দেশে ফেরার রোমাঞ্চকর কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে ওডেসী। এতে রয়েছে সেনাপতি ওডেসীয়ুসের বিভিন্ন বিচিত্র অভিযানের কথা।

হোমারের যুগের গ্রীসের চিত্রঃ হোমারের যুগে অ্যাকিয়ান, ডোরিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠীদের সংস্কৃতি ছিল আদিম ধরনের। হোমারের কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে সেকালের গ্রীসের মানুষ প্রধানত কৃষি ও পশুপালনই করতেন। চাষ হত প্রধানত যব। আর পশু ছিল ভেড়া ও ছাগল। মানুষ নিজেরাই নিজেদের সব জিনিস তৈরি করতেন। সেকালের গ্রামসমাজ গোষ্ঠীর ভিত্তিতেই গঠিত ছিল। তবে সমাজের সকলের অবস্থা সমান ছিল না। দাসও ছিল অনেক। ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়েছিল ও ক্রীটের প্রভাবে গড়ে-ওঠা নগরসভ্যতারও পত্তন ঘটেছিল। এ যুগের গ্রীকরা লিখনপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়নি। তবে ব্রোঞ্জ যুগে শেখা আঙুর ও জলপাইয়ের চাষ তখনো চলত। ক্রীটের কাছ থেকে শেখা ধাতুশিল্পের কাজও তখন করা কত। তাছাড়া নৌবিদ্যায় গ্রীকরা তখন যথেষ্ট পারদর্শী হয়েছিল।

হোমারের মহাকাব্য দুটি থেকে প্রাচীন গ্রীসের জীবনযাত্রার এসব কথা জানা যায় বলে গ্রীসের ইতিহাসে কাব্য-দুটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। আর এ যুগকে সেজন্যেই হোমারের যুগ বলা হয়। আমাদের দেশের রামায়ণ-মহাভারত থেকেও আমরা আমাদের দেশের সমাজের বিষয় জানতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র

হোমারের যুগের পর থেকে গ্রীসের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটতে থাকে। ব্রোঞ্জযুগের এবং লৌহযুগের কারিগরি ও অন্যান্য আবিষ্কারের ফলে গ্রীক সমাজের নতুন বিকাশ ঘটে। গ্রীসের বিভিন্ন দ্বীপে ও নগরে লোহা ঢালাইয়ের প্রচলন হয়েছিল। মাটির পাত্র, তাঁতের কাপড়, পাথরের দালান-কোঠা নির্মিত

হতে আরম্ভ হয়েছিল। এইভাবে নতুন নতুন পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

কারিগরি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমশ গ্রীসে হোমারের যুগের গ্রীক সমাজের অবসান ঘটে। তার জায়গায় গড়ে উঠল বড় আকারের অর্থনৈতিক কেন্দ্র—নগর। গ্রীসের এ সকল নগরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এগুলিতে শুধু অর্থনীতিক কাজকর্ম হত না, রাজনৈতিক কাজকর্মও হত। নগরগুলি তার চারপাশের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে নগরগুলি ছিল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এক-একটি রাষ্ট্র। তাই এদের বলা হয় **নগর-রাষ্ট্র।**

এ সমস্ত নগর-রাষ্ট্রে বড় বড় দালানকোঠা থাকত অভিজাত ধনীদের জন্য। চকবাজার, সর্বজনীন মিলনস্থান বা **অ্যাগোরা** থাকত ব্যবসা-বাণিজ্য, সভাসমিতির জন্য; আর থাকত মন্দির। সারা নগর ঘিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের দুর্গ ছিল **অ্যাক্রোপলিশ** নামে। এইসব অ্যাক্রোপলিশকে ঘিরেই গড়ে উঠত যত নগর-রাষ্ট্র।

গ্রীসের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নগর-রাষ্ট্রের পরিচয় **এথেন্স** নগর-রাষ্ট্র। দ্বিতীয় দক্ষিণ গ্রীসের পিলোপনেসাস-এর ল্যাকোনিয়া অঞ্চলে ছিল **স্পার্টা** নগররাষ্ট্র। তৃতীয় পিলোপনেসাসের মধ্যে **করিন্থ** নগররাষ্ট্র। এ ছাড়া আরও অসংখ্য নগররাষ্ট্র ছিল গ্রীসের মূল ভূখণ্ড ও ভূমধ্যসাগরের সর্বত্র ছড়িয়ে।

নগর-রাষ্ট্রগুলিতে অভিজাত ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের সংঘর্ষ লেগেই থাকত।

উপনিবেশ বিস্তার

যে-সব নগর-রাষ্ট্রে ভালো পোতাশ্রয় ছিল তাদের মধ্যে কারিগরি ও ব্যবসা দ্রুত প্রসার লাভ করে। কোনও নগররাষ্ট্রের খ্যাতি ছিল পশমের পোশাকের জন্য; আবার কোনও নগররাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্রের সুনাম ছিল বেশি। গ্রীক ব্যবসায়ীরা কাঠের জাহাজ তৈরি করে নিজের দেশের কারিগরি জিনিস অন্যদেশে বিক্রয় করে আসতেন।

প্রথম প্রথম জাহাজগুলো অল্প কয়েক দিনের জন্য বিদেশের উপকূলে নোঙর ফেলে নিজেদের জিনিস বিক্রয় করে তার বদলে আমদানি করত খাদ্যশস্য, গবাদি পশু, পশম, মাছ আর ক্রীতদাস। তারপর এঁরা স্থায়ীভাবে বিদেশের উপকূলগুলিতে বসবাস আরম্ভ করলেন।

নানা কারণে লোকে তখন ঐভাবে বিদেশে বসবাস করতে যেতেন। কারিগর আর ব্যবসায়ীরা যেতেন ব্যবসাবাণিজ্যের নতুন বাজারের সন্ধানে। নগররাষ্ট্রের গরিবরা পেটের দায়ে যেতেন ভাগ্য সন্ধানে।

এইভাবে ঈজীয়ান সাগরের উপকূলে, কৃষ্ণসাগরের সমস্ত উপকূল জুড়ে, আফ্রিকার উত্তর উপকূলে, ইতালীতে, স্পেনে এবং ঈজীয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে এমন অসংখ্য গ্রীক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। নতুন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সময় গ্রীকরা দল বেঁধে নৌকায় করে কৃষক, কারিগর, সওদাগর, পুরোহিত প্রভৃতিদের নিয়ে যেত। উন্নত ধরনের লোহার অস্ত্রের জোরে তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের তাড়িয়ে তাদের জোতজমা দখল করে নিতেন আর তাঁদের পরিণত করতেন দাসে।

প্রায় প্রত্যেকটি উপনিবেশই দাসশ্রমের ভিত্তিতে এক-একটি নগর-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। উপনিবেশ বলতে আমাদের মনে হয় মূল ভূ-খণ্ডের অধীন এক-একটি অঞ্চল। কিন্তু গ্রীক উপনিবেশগুলি তেমন ছিল না। এরা ছিল স্ব স্ব প্রধান। তবে প্রত্যেকটি উপনিবেশের লোকই তাঁদের আদি নগর-রাষ্ট্রের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতেন। যেখানেই উপনিবেশ থাকত সেখানের সকলেই নিজেদের গ্রীক বলে গর্ব করতেন।

উপনিবেশের গুরুত্বঃ গ্রীসের অর্থনীতিক জীবনে উপনিবেশ-গুলির গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। উপনিবেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে গ্রীসের পণ্যের চাহিদা বাড়ে এবং গ্রীসের শিল্পের বিকাশ ঘটে। উপনিবেশগুলি থেকে ক্রীতদাস গ্রীসে আসায় গ্রীসে দাসদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর গ্রীক উপনিবেশগুলিতেও কারিগরি ও শিল্পের

প্রসার ঘটে এবং তাঁদের প্রভাবে স্থানীয় আদিবাসীরা ধীরে ধীরে সভ্যতার পথে পা বাড়ান।

তৃতীয় পাঠ

এথেন্স ও স্পার্টার সমাজজীবন

গ্রীসের নাগরিক জীবনের পরিচয় আমরা পাই দুই বিখ্যাত রাষ্ট্র থেকে—এথেন্স আর স্পার্টা। এই নগর-রাষ্ট্র দুটির জীবনধারা প্রবাহিত হত দুটি ধারায়।

ধনী ও দরিদ্রদের জীবনঃ অ্যাটিকার অধিকাংশ উর্বর ক্ষেত্র এথেন্সের অভিজাতদের অধিকারে চলে আসে। অনেক কৃষক তখন ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন। ঋণ শোধ দিতে না পারলে তাঁদের ঋণদাসে পরিণত হতে হত। ধনী অভিজাত শ্রেণীর লোক ছাড়া এথেন্সের অন্য সবাইকে বলা হত **ডেমস** বা সাধারণ লোক। কৃষক, কারিগর, নাবিক ও জনমজুররাই ছিলেন ডেমস শ্রেণীভুক্ত। তবে তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী কি জাহাজ মালিক কিংবা দাসদের প্রভু।

ছাত্রজীবনঃ দাসশ্রমের সাহায্যে সংসারের ও কারিগরির সব কাজ করানোর ফলে এথেন্সের স্বাধীন নাগরিকদের হাতে প্রচুর অবসর ছিল। তাঁদের পরিবারের ছেলেরা ৭ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত পাঠশালায় পড়ত। সেখানে তাদের শেখানো হত পড়া, লেখা আর অঙ্ক কষা। হোমারের কবিতাও ছাত্রদের মুখস্থ করতে হত। তাছাড়া আঁকা, নাচা, আর গানবাজনা, কুস্তি, বর্শা ছোঁড়া, দৌড়, লাফ—এসবও ছাত্রদের শিখতে হত। এক কথায় দেহ ও মনের পূর্ণ বিকাশ ছিল এদেশের শিক্ষার লক্ষ্য। এখানে মেয়েদের পাঠশালা ছিল না বাড়িতে বসেই তারা এমব্রয়ডারি, সেলাই, গানবাজনা শিখত। ১৮ বছর বয়সে ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা নিতে হত। তারপর তাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব দান করা হত।

এথেন্সের ধনীদেরও ঘরবাড়ি ছিল সাধারণ। মেয়েরা ঘর-

গৃহস্থালীর দেখাশুনা করতেন। পুরুষরা বাড়ির বাইরেই কাটাতেন। এথেন্সের সর্বজনীন চত্বর বা অ্যাগোরা ছিল নগরের মাঝখানে। সকালে অ্যাগোরাতে জমে উঠত হৈ-হট্টগোলের বাজার। কারিগরি পণ্যের মতো দাসদেরও এ বাজারে কেনাবেচা হত। অ্যাগোরার শেষ প্রান্তে দোকানপাট ছিল না। সন্ধ্যায় দিনের তাপ কমলে এখানে জমত অভিজাত ও ধনী কারিগরদের আড্ডা আর মজলিস। পাথরে খোদাই করা আইন টাঙানো থাকত অ্যাগোরাতে। এছাড়া তরুণ ও বৃদ্ধেরা শুনতেন বক্তৃতা কিংবা কথকতা। সঙ্গীতের আসর বসত বিরাট কনসার্ট ঘরে। বছরে কয়েকবার নাটকেরও অভিনয় হত। তাছাড়া ছিল খেলাধুলার স্টেডিয়াম।

গ্রীসের লোকেদের আনন্দের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ছিল অলিম্পিক ক্রীড়া। দক্ষিণ গ্রীসের পিলোপনেসের অলিম্পিয়াতে প্রতি চার বছর অন্তর এই ক্রীড়া-উৎসব বসত। এখানে দৌড়, লাফ, কুস্তি, ডিসকাস ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া, রথ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি হত। যে-কোন গ্রীকই এতে যোগ দিতে পারতেন। তবে প্রকৃতপক্ষে শুধু ধনীরাই এতে অংশ নিতেন। গ্রীক উপনিবেশ থেকেও হাজারে হাজারে লোক অলিম্পিক খেলা দেখতে আসতেন। এর আরম্ভ হয়েছিল ৭৭৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে।

স্পার্টা ঃ স্পার্টার সমাজজীবন ছিল এথেন্স থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্পার্টার সমাজও ছিল দাস-নির্ভর। দাসদের বলা হত হিলট। হিলট বা দাসরা স্পার্টানদের ভীষণ ঘৃণা করত। তাই তাঁদের দমন করার জন্য স্পার্টানদের সামরিক শক্তির চর্চা করতে হত। স্পার্টান মাত্রেই সর্বদা অস্ত্র নিয়ে বেড়াতেন। শান্তির সময়েও স্পার্টানরা এমনভাবে থাকতেন যে মনে হত তাঁরা যুদ্ধে রত। দিনের পর দিন তাঁদের সামরিক শিবিরে যুদ্ধবিদ্যা শিখে কাটাতে হত। তাঁদের কথা ছিল সংযত ও সংক্ষিপ্ত।

ছেলেবেলা থেকেই স্পার্টার ছেলেদের হিলটদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা হত। শিক্ষা দেওয়া হত যুদ্ধের। আর কঠোর নিয়ম-

কানুনের মধ্যে রাখা হত। বারো বছর বয়স হলে ছেলেদের এক বস্ত্রে থাকতে হত। লতাপাতা কুড়িয়ে তাই মাথায় দিয়ে শুতে হত। বিলাসিতার কোন অভ্যাস করতে দেওয়া হত না। এথেন্সের মতো সংস্কৃতিগত শিক্ষা স্পার্টায় দেওয়া হত না। এখানে শরীরচর্চাই ছিল প্রধান ব্যাপার। বিনা বাক্যব্যয়ে বয়স্কদের আদেশ পালন করতে হত বালক ও তরুণদের। বড়োরা বললে তবেই তারা কথা বলতে পারত।

৭ বৎসরের পর থেকে স্পার্টার ছেলেদের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করত। একসঙ্গে সরকারী আবাসে সকলে একভাবে বেড়ে উঠত। দলের মধ্যে যে শক্তিসামর্থ্যে প্রধান ছিল সে হত নেতা, আর তার কথা অন্যদের মেনে চলতে হত। যেটুকু লেখাপড়া না করলে নয় তার বেশি কিছু তাদের শেখানো হত না। আর অন্য সময় সবটুকু ব্যয় করা হত সামরিক জীবনযাপনের শিক্ষায়। তাদের মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা হত, খালি পায়ে হাঁটতে হত।

এভাবে কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় স্পার্টার নাগরিকেরা সামরিক শক্তিতে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

চতুর্থ পাঠ

এথেন্স ও স্পার্টার রাজনৈতিক জীবন

এথেন্সঃ আদি যুগে অন্য সব গ্রীক রাষ্ট্রের মতো এথেন্সেও রাজার শাসন প্রচলিত ছিল। পরে রাজার শাসনের পরিবর্তে এথেন্সে অভিজাত পরিষদের শাসন প্রবর্তিত হয়। 'প্রবীণ পরিষদ' ও অভিজাতদের নির্বাচিত নয়জন শাসন চালাতেন। সাধারণ মানুষ বা ডেমসদের উপর এরা কঠোর উৎপীড়ন করতেন। তাই মাঝে মাঝেই সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ ঘটত। কোলোন নামে এক শাসক

পরবর্তী কালে ৪০০ জন লোকের একটি নতুন পরিষদ গঠন করেন। এতে অভিজাতদের পরিষদের ক্ষমতা খর্ব হয়। তিনি এথেন্সে বসবাসকারী নাগরিক ও বিদেশী সকলকেই নাগরিক অধিকার দান করেন। এরপর আর একজন সংস্কারক সব স্বাধীন নাগরিকদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দান করেন। এতে চূড়ান্তভাবে অভিজাত-শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব হয়। আরও পরে পেরিক্লিসের আমলে এথেন্সে গণতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটেছিল।

এথেন্সের নাগরিকদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁরা দাস রাখতে পারতেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন করতে পারতেন। জনগণের পরিষদে অংশ গ্রহণের অধিকারও ছিল। সৈন্যদল কিংবা নৌবাহিনীতে তাঁদের যোগ দিতে হত।

স্পার্টাঃ স্পার্টার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল হিলট-দের শাসন। এদের শাসন করতে হলে দরকার সেনাবাহিনী, আইন আর বিচার-ব্যবস্থা। রাজ্যের সব ক্ষমতা ছিল স্পার্টানদের হাতে। এদের ছিল এক অভিজাত পরিষদ। তা থেকে প্রবীণদের কাউন্সিল নির্বাচিত হত। তাঁদের মধ্যে দুজনকে করা হত রাজা। তাঁরাই সেনাপতি হতেন। এছাড়া ছিল নাগরিকদের এক সাধারণ পরিষদ। কিন্তু সব স্পার্টানরা এর সদস্যপদ পেতেন না। কেবল বিত্তশালী যোদ্ধারাই এর সদস্য হতে পারতেন। অস্ত্রধারণক্ষম স্পার্টানমাত্রকেই সৈন্যদলে যোগ দিতে হত। আইন করে তাঁদের অন্য কোন কাজ করতে দেওয়া হত না।

এথেন্স বনাম স্পার্টা

এথেন্স এবং স্পার্টা নগর-রাষ্ট্রদুটি ক্রমেই ক্ষমতাশীল হচ্ছিল। তখন সাগরপারের দেশ ইরানের অভ্যুদয় হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব পারের গ্রীক উপনিবেশগুলির ঐশ্বর্য ও সম্পদ দেখে পারস্য সেই দেশগুলি জয় করতে এগিয়েছিল। এথেন্স তাদের সাহায্য দেওয়ায়

পারসিকরা এথেন্সের বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালিয়েছিল। তবে এথেন্স অধিকাংশ নগর-রাষ্ট্রদের নিয়ে এক জোট বেঁধে পারস্যের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল।

পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ থামলেও এথেন্স সে সামরিক জোট ভেঙে দেয়নি। ঐ জোটের সাহায্যে এথেন্স গ্রীসের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। এথেন্সের এই শক্তিবৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে স্পার্টা এথেন্সকে বাধা দেয়। এছাড়া রাষ্ট্রদুটির সমাজ, রাজনীতি সবই আলাদা ছিল বলে দু-দেশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ৪৩১ অব্দে স্পার্টা এথেন্স আক্রমণ করে। স্পার্টা পিলোপনেসের অন্তর্গত বলে এথেন্স বনাম স্পার্টার যুদ্ধ পিলো-পনেসীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রায় ২৭ বৎসর ধরে এ যুদ্ধ চলেছিল। এ যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয় ঘটে। তখন এথেন্স স্পার্টার পদানত হয়। সেই সঙ্গে গ্রীসেরও গৌরবের যুগের অবসান হয়।

পঞ্চম পাঠ

এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব

সামরিক ক্ষেত্রে স্পার্টার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করেন। এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি ছিল তার সাহিত্য, শিল্প, ধর্মাচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

সাহিত্যঃ এথেনীয় কবিগণ গীতিকাব্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। **পিন্ডার** ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এথেন্সবাসীই পৃথিবীতে সর্ব-প্রথম নাটক রচনা ও অভিনয় করেন। গ্রীক নাট্যকার **এসকাইলাস** পারস্যের পরাজয় উপলক্ষে একটি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর পরের বিখ্যাত নাট্যকার হলেন **সফোক্লিজ** এবং **ইউরিপিডিস**। এঁরা সকলেই বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখ

হাসি-ঠাট্টা ও ক্রোধের বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন **অ্যারিস্টোফেনিস**। এথেন্সের নাট্যকারদের লক্ষ্য ছিল নাটকের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে মহত্তর জীবনের আদর্শে প্রেরণা যোগানো। এছাড়া ছিল ইতিহাস-সাহিত্য। এথেন্সের ঐতিহাসিক হিরোডোটাসই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম শেখান কিভাবে সত্যকার ইতিহাস লিখতে হয়।

শিল্পঃ শিল্পকলার সকল বিভাগেও ছিল এথেনীয়দের কৃতিত্ব। ভাস্কর্যে শ্রেষ্ঠ নাম হচ্ছে **ফিডিয়াস ও প্রাক্সিটেলিজের**। পারস্য সম্রাট জারেক্সেজ এথেন্স নগরী ভস্মীভূত করেছিলেন। স্থপতি ও ভাস্কর ফিডিয়াস সেই ধ্বংস-প্রাপ্ত এথেন্সকে আবার রূপময়ী নগরীতে পরিণত করেন। তাঁর মহত্তম কীর্তি অ্যাথিনা দেবীর মন্দির পার্থেনন।



গ্রীক দেবতা

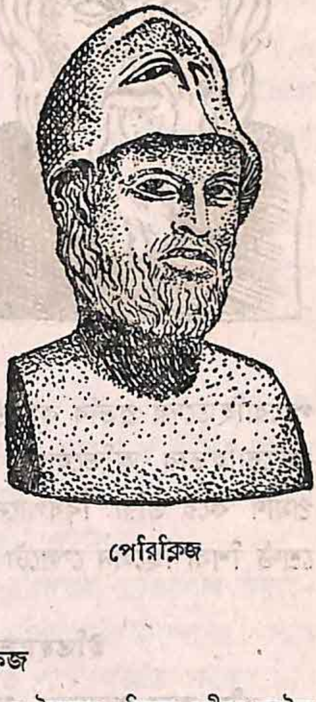
ধর্মাচরণঃ গ্রীকগণ আদি যুগে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে পূজা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে দেবতারা অলিম্পিক পর্বতের চূড়ায় বাস করতেন। সেটাই স্বর্গ। গ্রীক দেবতাদের রাজা হলেন বজ্রধারী **জীয়ুস**। তাঁর ভ্রূ থেকে জন্ম নিয়েছেন **অ্যাথিনা** দেবী। তিনি হলেন গ্রীসের রক্ষাকর্ত্রী আর বিদ্যায় সরস্বতী। অ্যাপোলো হলেন কন্দর্পকান্তি সূর্যের দেবতা। সাত ঘোড়ার চাকার রথে চড়ে তিনি পৃথিবীতে আলো দিয়ে বেড়ান। **ডাইনোসীয়াস** ছিলেন বরুণদেব। তাঁর পূজার উপলক্ষে গ্রীকগণ নাটক অভিনয় করতেন। তা থেকেই নাটক রচনার আরম্ভ।

এথেন্সের মনীষীদের পরিচয়

যেসব মহামনীষীর চেষ্টায় এথেন্স পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল তাঁদের কয়েকজনের বিষয় এখানে আলোচনা করা হল।

মহান পেরিক্লিজ

এথেন্সের গৌরবময় যুগের আরম্ভ পেরিক্লিজ থেকে। তিনি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর শিক্ষায় দীক্ষায় ও অপূর্ব প্রতিভাবলে তিনি এথেন্সের ভাগ্যবিধাতা হয়ে পড়েন। পারস্যের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত এথেন্সকে তিনি নতুন করে গড়েন। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতায় দেশবাসী তাঁর হাতে দেশ-শাসনের সকল ভার তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় শিল্পে সাহিত্যে এথেন্স শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। এথেন্সের উন্নতিই ছিল তাঁর দিবারাত্রির একমাত্র চিন্তা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্পার্টা যখন এথেন্স আক্রমণ করে, তখন অবরুদ্ধ এথেন্সে মহামারীর আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়।



পেরিক্লিজ

নাট্যকার সোফোক্লিজ

এসকাইলাস ছিলেন সর্বপ্রাচীন গ্রীক নাট্যকার। কিন্তু গ্রীক নাটক পূর্ণতা লাভ করে সোফোক্লিজের হাতে। কথিত আছে যে তিনি প্রায় ১৩০ খানি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র সাতটির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁর নাটক ছিল বিয়োগান্ত। তিনি নাটককে করেছিলেন লোকশিক্ষার প্রধান বাহক। পেরিক্লিজ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি এথেন্সের সৈন্যবাহিনীতেও যোগ দিয়েছিলেন।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিস

পৃথিবীর দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলেন মহাজ্ঞানী সক্রেটিস। তিনি দেখতে সুপুরুষ ছিলেন না। অতি সাধারণ পোশাকে এথেন্সের রাজপথে ঘুরে বেড়াতেন। পথে অভিজাত তরুণদের দেখলেই তাঁদের নিয়ে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে নানা আলোচনা করতেন। তাঁর সঙ্গে এইভাবে আলোচনায় লিপ্ত হয়ে এথেন্সের তরুণদের মন থেকে ধর্মের কুসংস্কার কেটে যেতে আরম্ভ করে। শিল্প, সাহিত্য, সকল বিষয়ে তাঁদের একটা সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। এর ফলে তরুণদের মধ্যে গ্রীক প্রবীণ পুরোহিতদের প্রভাব কমতে থাকে। তখন তাঁরা সক্রেটিসের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনেন। বিচারে সক্রেটিসকে অপরাধী প্রমাণ করে তাঁরা বিষপানে তাঁকে আত্মহত্যার নির্দেশ দেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন প্লেটো।



সক্রেটিস

ইতিহাসের জনক হিরোডোটাস

গ্রীস আর পারস্যের সঙ্গে যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে তখন সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন হিরোডোটাস। তিনি সে-যুদ্ধের অপূর্ব ইতিহাস রচনা করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম শিখিয়েছিলেন কি করে সত্য মিথ্যা কিংবদন্তি থেকে বেছে নিয়ে সঠিক ইতিহাস রচনা করতে হয়। মিশর, পারস্য প্রভৃতি অনেক রাষ্ট্রের আদি ইতিহাস তাঁর লেখা থেকে জানা যায়। তিনিই মিশরকে নীলনদের দান বলে উল্লেখ

করেছেন। তাঁর ইতিহাসের ভাসা অতি সরল ও হৃদয়গ্রাহী। অনেকে তাঁর রচনাবলীকে নাটকের সঙ্গে তুলনা করেন।

ষষ্ঠ পাঠ

ম্যাসিডনের অভ্যুদয়

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি দীর্ঘকাল পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে শক্তিক্ষয় করছিল। তখন বলকান অঞ্চলে অবস্থিত ম্যাসিডন রাষ্ট্রের রাজপুত্র ফিলিপ থীবস্ রাষ্ট্রে এসেছিলেন সেখানকার নতুন যুদ্ধবিদ্যা আর সংস্কৃতির শিক্ষা নিতে। রাজা হয়ে তিনি ঢেলে সাজালেন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে। নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করলেন তাকে। আর নিজের রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে দিলেন মন। মহামনীষী অ্যারিস্টটলের উপর দিলেন ছেলে আলেকজাণ্ডারের শিক্ষাদীক্ষার ভার। নিজে তিনি যেমন গ্রীসের সভ্যতা-সংস্কৃতির পূজারী ছিলেন তেমনি ছেলেকেও করতে চেয়েছিলেন গ্রীসের গৌরবে গৌরবান্বিত।

নতুন দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি সমগ্র গ্রীসকে ঐক্যবদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। পুত্র আলেকজাণ্ডার মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তাঁর সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে নামলেন। সমস্ত গ্রীস রাষ্ট্রজোটকে তিনি পরাস্ত করে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন গ্রীসে।

তারপর চাইলেন পারস্যের নিকট পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে। বিপুল বাহিনীও তৈরি করলেন পারস্য অভিযানের উদ্দেশ্যে। তবে অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সে সাধ আর পূর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছিলেন পুত্র দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার।

আলেকজাণ্ডার

ফিলিপের হঠাৎ মৃত্যুতে গ্রীসের কোন কোন রাষ্ট্রে ম্যাসিডনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসে প্রথমেই তাদের দমন করলেন। তারপর প্রস্তুত হলেন জগৎজয়ের অভিযানের জন্য।

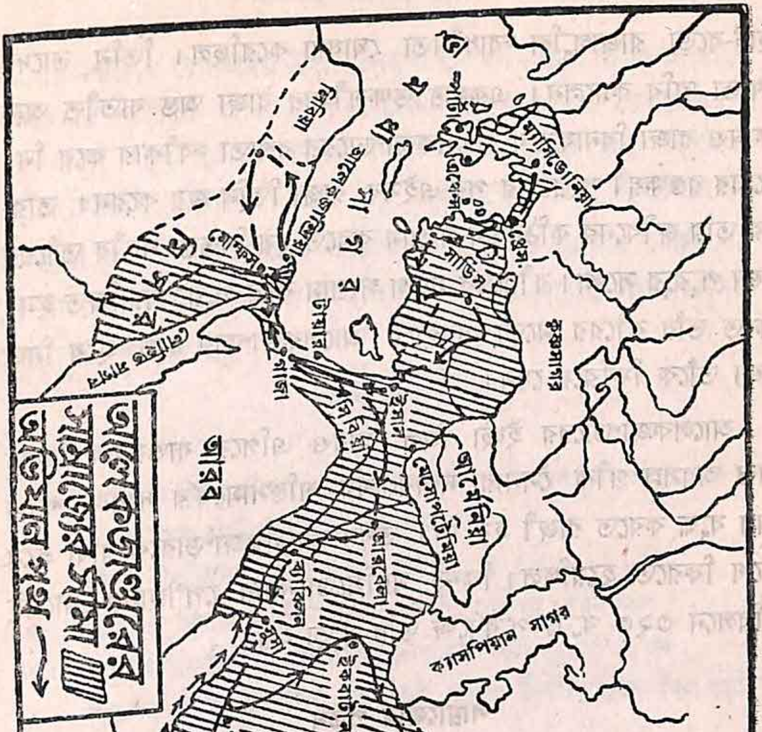
আলেকজাণ্ডারের বয়স তখন কুড়ি বছর মাত্র। কৈশোরে তাঁর আদর্শ বীর ছিলেন ট্রয় যুদ্ধের গ্রীক সেনাপতি অ্যাকিলিস। তিনি দিগ্বিজয় যাত্রার পূর্বে তাঁর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন। তারপর ৩৩৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ম্যাসিডোনীয় ও গ্রীক সৈন্যদের মিলিত বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন এশিয়া মাইনর। দুটি যুদ্ধে পারসিক বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে তিনি এশিয়া মাইনর জয় করলেন। তারপরে চললেন ভূমধ্য-সাগরের তীর ধরে দক্ষিণে। সেখানকার গ্রীক উপনিবেশগুলি পারস্যের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তির চেষ্টা করছিল। আলেকজাণ্ডার সহজেই সমস্ত গ্রীক উপনিবেশ জয় করে নিলেন। মিশর বিনা-যুদ্ধেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। সেখানকার পুরোহিতরা তাঁকে ভগবান বলে ঘোষণা করলেন।


আলেকজাণ্ডার

মিশর থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি পারস্যের অধীন মেসোপটেমিয়ায় অভিযান করলেন। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস স্বয়ং তাঁকে বাধা দিতে এসে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি পলায়ন করে কোনও রকমে আত্মরক্ষা করলেন। তাঁর রাজধানী ভস্মীভূত হল। তবে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। মেসোপটেমিয়া বিজয়ের পর আলেকজাণ্ডার পারস্যের অধীনস্থ মধ্য-এশিয়ার রাজ্যগুলি জয় করলেন।

ভারত অভিযান

এইবার আলেকজাণ্ডারেব দৃষ্টি গেল পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের পারসিক রাজ্যগুলির দিকে। পারস্যের পরাজয়ের সংবাদে এখানকার


অভিযান পথ
ক্যাসপিয়ান সাগর
উড়াল সাগর
আরব সাগর
আরব
ভারত
কৃষ্ণসাগর
ম্যাসিডোনিয়া

ছোট-বড়ো রাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। তিনি তাদের বশ্যতা দাবি করলেন। একমাত্র তক্ষশীলার রাজা অম্ভ ব্যতীত অন্য কোনও রাজা বিনাযুদ্ধে আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে নি। কঠোর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এইসব রাজ্য তিনি জয় করেন। তারপর তাঁর জীবনের কঠিনতম সংগ্রাম করতে হয় বিতস্তা নদীর তীরের রাজা পুরুর সঙ্গে। বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে পুরু পরাজিত হন। কিন্তু তাঁর বীরের মতো ব্যবহারে আলেকজান্ডার মুগ্ধ হয়ে নিজ রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

আলেকজান্ডারের ইচ্ছা ছিল আরও এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন গ্রীক সৈন্যরা নন্দবংশের শক্তিসামর্থের সংবাদ শুনে আর যুদ্ধ করতে রাজী হয় নি। তখন আলেকজান্ডারকে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ায় পৌঁছানর আগেই বাবিলনে ৩২৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাম্রাজ্যের পতন

আলেকজান্ডার বিভিন্ন রাজ্য জয়ের পরে নিজের প্রধান সেনাপতিদের হাতে সেই বিজিত রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেই স্ব-স্ব প্রধান হয়ে ওঠেন। সেনাপতি **সেলুকাস** নিজেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সমগ্র মধ্য এশিয়ার সিরিয়া সাম্রাজ্যের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। অন্য এক সেনাপতি টলেমি দখল করলেন মিশর। আর অ্যান্টিগোনাস ম্যাসিডনের রাজা হয়ে বসলেন। পারস্যের বদলে পূর্বাঞ্চলের লোকেরা এবার গ্রীসের পদানত হল।

রোম কর্তৃক গ্রীস জয়

পূর্বাঞ্চলে ম্যাসিডোনিয়ার যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব দিকের আর্থিক ও সংস্কৃতির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। এর কারণ

ছিল ঐ অঞ্চলের লোকদের উপর নির্মম শোষণ। স্থানীয় জনসাধারণ ম্যাসিডনীয় ও গ্রীক অভিযাত্রীদের সেজন্য ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।

এ যুগে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দিকে যে-সব রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল সেগুলি মোটেই শক্তিশালী ছিল না। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর রোমান আক্রমণের যুগে তারা সহজেই পরাজিত হয়েছিল। দেখতে দেখতে সমগ্র গ্রীসই রোমানদের পদানত হয়।

অনুশীলনী

প্রবন্ধধরণের প্রশ্ন ঃ

১। হোমারের যুগের গ্রীসের চিত্রসহ গ্রীক সভ্যতার বিবরণ লিখ।
২। গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার বিবরণ লিখ।
৩। গ্রীসের উপনিবেশ সম্বন্ধে যা জান তার পরিচয় দাও।
৪। এথেন্সের সামাজিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবন কেমন ছিল ?
৫। স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।
৬। স্পার্টার থেকে এথেন্সের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব কিসে কিসে ছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখ।
৭। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা দাও। ভারতে তার আগমন কখন হয় ?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। ক্রীটের সভ্যতা আগে না গ্রীসের সভ্যতা আগে ?
২। হোমারের মহাকাব্য দুইটির নাম কি ?
৩। সোফোক্লিস, হিরোডোটস, সক্রেটিস—এরা কেন বিখ্যাত ?

বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন ঃ

[হ্যা কি না '√' কিংবা '×' চিহ্ন দিয়ে দেখাও]

১। দারিয়ুস ম্যারাথনে গ্রীকদের পরাজিত করেন......
২। স্পার্টানদের নিকট এথেন্স পরাজিত হয়েছিল......
৩। সামরিক বিষয়ে স্পার্টা শ্রেষ্ঠ ছিল......
৪। ইলিয়াড গ্রন্থটি মহাকবি হোমারের লেখা ......
৫। ওডেসী গ্রন্থটি দার্শনিক সক্রেটিসের লেখা ......

সপ্তম অধ্যায়

রোমের অভ্যুদয়

প্রথম পাঠ

রোম নগরীর আদিকাল

দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী গ্রীক সাম্রাজ্য যাঁরা পদানত করেন তাঁরা গ্রীসেরই পশ্চিমের ইতালী উপদ্বীপের রোমরাষ্ট্রের অধিবাসী।

ইতালীর উপকূলভাগে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল নানা গ্রীক উপনিবেশ। এই গ্রীকরাই দক্ষিণাংশে তাদের বসতির নাম দেন **ইটালিক**। তা থেকে কালক্রমে গোটা উপদ্বীপটির নাম হয়েছে ইটালি।

টাইবার নদীর নিম্নভাগে ছিল লাটিন জাতির বসতি। টাইবার সাতটি পাহাড়ের গা বেয়ে নামবার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। লাটিন জাতি সেই সংকীর্ণ তীরে সাতটি পাহাড়ের আড়ালে খ্রীঃপূঃ ৭৫৩ অব্দে গড়ে তুলেছিল ছোট্ট একটি নগর—রোম। নদী থেকে উঁচু খাড়া টিলার উপর ছিল নগরটির দুর্গ ও প্রাচীর।

চারিপাশ জুড়ে ছিল মেটেকোঠা আর কাঠের ঘরবাড়ি। ঘর ছাওয়া ছিল খড় কি টালি দিয়ে। সরু সরু আঁকাবাঁকা খোলা রাস্তা ছিল নগরটিতে। পাহাড়ের আড়ালের ফাঁকা জায়গায় বসত বাজার। এ জায়গার নাম ছিল **ফোরাম**। রাস্তার পাশে কিংবা ফোরামে বসে মুচি, কামার কি অন্যান্য কারিগররা কাজ করতেন। তবে অধিবাসীদের অধিকাংশই করতেন কৃষি ও পশুচারণ।

কিংবদন্তিঃ রোম নগরী প্রতিষ্ঠার একটি চমৎকার কিংবদন্তি আছে। লাটিন রাজ্যগুলির কোনও রাজা তাঁর ভাইঝির দুই যমজ ছেলে রেমাস ও রোমুলাসকে টাইবার নদীতে ডুবিয়ে মারার নির্দেশ দেন। ভাই দুটি অদৃষ্ট জোরে বেঁচে ওঠে। একটি বাঘিনী প্রথমে দুধ খাইয়ে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। পরে তাঁরা এক রাখালের ঘরে পালিত হন। বড়ো হলে দুই ভাইতে ঝগড়া হয়। তাতে রেমাস মারা যান। তখন রোমুলাস যেখানে বাঘিনী মা তাকে দুধ খাইয়ে

ছিল সেখানে গিয়ে একটি নগর গড়ে নিজে তার রাজা হয়ে বসেন। রোমে এই বাঘিনী মাতার একটি স্মারক মূর্তিও নির্মিত হয়েছে।

১৯৬০ সালে রোমে যখন অলিম্পিক হয় তখন পৃথিবীর সব দেশের লোক একটা জিনিস দেখে অবাক হন। রোমের সর্বত্র তাঁরা বাঘিনী মাতার ছবির সঙ্গে অলিম্পিকের প্রতীক দেখেছিলেন। এতে অবাক হবার কিছু নেই।

দ্বিতীয় পাঠ

রোম ও কার্থেজের দ্বন্দ্ব

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাঃ কালে কালে রোম নগরী বড় হয়ে উঠল। তখন খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে এখানে এক নিষ্ঠুর রাজা রাজত্ব করতেন। রোমের লোকে মিলিত হয়ে একদিন তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দিলেন। তারপর প্রতিষ্ঠা করলেন সাধারণতন্ত্র। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রোমের ক্ষমতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তারপরে দুশো বছর যুদ্ধ করতে করতে একদিন রোমের সাধারণতন্ত্র সারা ইতালীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলল।

সারা ইতালী উপদ্বীপ জয়ের পরে রোমের শাসকদের দৃষ্টি পড়ল ভূমধ্যসাগরের উপকূলের অন্যান্য গ্রীক উপনিবেশগুলির উপর।

এসব উপনিবেশের মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় ছিল ইতালীর ঠিক দক্ষিণের সিসিলি দ্বীপ। এখানে ছিল খুব উর্বর জমি, চমৎকার আঙুরের বাগান, কমলালেবু আর জলপাইয়ের চাষ। এই উপকূলের গ্রীক নগরগুলি ছিল খুবই ঐশ্বর্যশালী। সিসিলি দ্বীপটির উপর যেমন ছিল রোমের দৃষ্টি তেমনি ছিল কার্থেজেরও লোভ। সিসিলিকে কেন্দ্র করেই শুরু হল রোম-কার্থেজের যুদ্ধ।

কার্থেজঃ সিসিলির ঠিক উল্টো দিকে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে ছিল কার্থেজ। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে কার্থেজই ছিল পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগররাষ্ট্র। মিশর, গ্রীস, স্পেন ও ভূমধ্যসাগরের সমস্ত অঞ্চলের জাহাজ আসত কার্থেজে।

কার্থেজের নৌবাহিনী ছিল অজেয়। ভূমধ্যসাগরের উপকূলের বহুলাংশে এঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি সিসিলিরও অধিকাংশই ছিল কার্থেজের অধীন। ইতালীর এত কাছের সিসিলিতে রোমের নেতারা কার্থেজের আধিপত্য স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। তাঁরা সিসিলি আক্রমণ করলে কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল। রোম কার্থেজের যুদ্ধের নাম পিউনিক যুদ্ধ।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধঃ প্রথম পিউনিক যুদ্ধ আরম্ভ হয় ২৬৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। এ যুদ্ধ চলেছিল প্রায় ২০ বছর ধরে। যুদ্ধে কার্থেজের পরাজয় ঘটে। কার্থেজের সেনাপতি **হামিলকার বার্কা** পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর কিশোর-পুত্র হানিবলকে তিনি অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বলেন।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধঃ সিসিলি থেকে সরে এসে কার্থেজ এবার স্পেন জয় করল। এবার রোম দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ আরম্ভ করল ২১৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। এ যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বিশাল হস্তীবাহিনী নিয়ে আল্পস্ অতিক্রম করে হানিবলের দশ বৎসর ধরে রোম অবরোধ। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে হানিবল রোমের বিপুল বাহিনী ধ্বংস করেন। কিন্তু রোম তবু আত্মসমর্পণ করেনি। দীর্ঘ বারো বৎসর পর তাঁরা হানিবলের অবরোধ উপেক্ষা করে সমুদ্রপথে কার্থেজ আক্রমণ করেন। তখন হানিবলকে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি দেশে ফিরে রোমের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন নি। ২০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের অবসান ঘটে। রোম কার্থেজের সমস্ত নৌবাহিনী দখল করে এবং কার্থেজকে বিরাট ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল।


হানিবল

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধঃ দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের সামরিক শক্তি খর্ব হয়ে যায়। কিন্তু তার ব্যবসাবাণিজ্য ও ঐশ্বর্য তখনো রোমের ঈর্ষা জাগাতে থাকে। সেজন্য রোমানরা ১৪৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তৃতীয়বার যুদ্ধে নামল কার্থেজের বিরুদ্ধে। কার্থেজের পক্ষে এটা ছিল স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ন্যায়ের যুদ্ধ। কিন্তু সে-যুদ্ধেও কার্থেজের পরাজয় ঘটে এবং কার্থেজ ভস্মীভূত হয়। বিজেতা রোমানরা কার্থেজের ৫০ হাজার লোককে দাসরূপে রোমে নিয়ে আসেন।

রোম এরপর আর কার্থেজ জয় করেই সন্তুষ্ট রইল না। রোমান সাধারণতন্ত্র এগিয়ে চলল দিগ্বিজয়ের পথে।

তৃতীয় পাঠ

রোমের আদিসমাজ

সাধারণতন্ত্রের অবসানের আগেই রোমের সমাজ দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একটি ছিল প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত ও অপরটি প্লিবিয়ান বা সাধারণ লোক।

প্যাট্রিসিয়ানঃ আদিকাল থেকে যে-সব পরিবার রোমে বাস করছিলেন তাঁরা নিজেদের প্যাট্রিসিয়ান বলতেন। প্যাট্রিসিয়ান কথাটি এসেছে লাটিন পিটর বা পিতা থেকে। এঁদের সবচেয়ে বড় গর্ব ছিল যে রোম নগরের প্রতিষ্ঠাতা তাঁদেরই পূর্বপুরুষেরা। এই পরিবারের হাতেই ছিল যথেষ্ট জমিজমা ও গবাদি পশুচারণার ক্ষেত্র। এঁরা ছিলেন যথেষ্ট ধনী।

প্যাট্রিসিয়ানদের পরিবারে দাস দিয়ে ঘর-গৃহস্থালীর কাজ হত। তবে তখনো দাসদের সংখ্যা বেশী ছিল না। অভিজাত প্যাট্রিসিয়ানদের ঘরবাড়িও সেযুগে ছিল অতি সাধারণ। একটি মাত্র ছিল ঘর। ঘরের মাঝখানে জল জমা করার চৌবাচ্চা। তার ঠিক উপরে গর্ত করা থাকত। বৃষ্টির জল ঐ চৌবাচ্চয় গিয়ে জমা হত। আর সেই গর্ত দিয়ে বাইরের আলোয় ঘর আলো হত।

অভিজাতদের মধ্যের প্রবীণতম লোকদের নিয়ে সিনেট নামে একটি পরিষদ গঠিত হল। একজন রাজা এই সিনেট দিয়ে দেশ শাসনের কাজ করত।

প্লিবিয়ান ঃ রোম সাধারণতন্ত্রের রাজ্যসীমা যতই বাড়ছিল ততই রোমের লোকসংখ্যা বাড়ছিল। ইতালীর অন্যান্য অঞ্চলের নানা লোক রোমে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। রোমানরা আশেপাশের নগরগুলি জয় করে সেখানে অনেকের ভূ-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের রোমে আসতে বাধ্য করতেন। এইসব নবাগত অধিবাসী ও তাঁদের বংশধরদের বলা হত প্লিবিয়ান বা সাধারণ লোক। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন চাষী ও কারিগর। কৃষকদের যৎসামান্য জমিজমা ছিল। প্লিবিয়ানদের সবাই হতদরিদ্র ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী কিংবা জাহাজ মালিক।

প্লিবিয়ানদের কোন অধিকার ছিল না। যৌথ জমিজমাতেও তাঁদের কোন অংশ ছিল না। এঁদের মধ্যে যাঁরা অভিজাতদের ঋণ শোধ দিতে না পারতেন, তাঁরা হয়ে পড়তেন মহাজন অভিজাতদের ঋণদাস। এঁদের মধ্যে ছিলেন যত শ্রমিক, ক্ষুদ্র চাষী, কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সৈন্যরা।

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের দ্বন্দ্ব ঃ রোমের সমাজে এই দুই শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন দুটো বিপরীত দল। এক শ্রেণীর হাতে ছিল যত সুযোগ-সুবিধা আর অন্য দল ছিল সব কিছু থেকে বঞ্চিত। অথচ রোমান সাধারণতন্ত্রে নাগরিকদের সমস্ত কাজ করতে হত প্লিবিয়ানদেরই। তাঁদের যুদ্ধে যেতে হত, রাষ্ট্রকে কর দিতে হত। প্লিবিয়ানরা ক্রমে ক্রমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্যাট্রিসিয়ানদের সমান অধিকার দাবি আরম্ভ করলেন। তাঁরা ভয় দেখালেন যে তা না-হলে সৈন্যদলে নাম লেখাবেন না। সবাই রোম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। তখন বাধ্য হয়ে প্যাট্রিসিয়ানরা এঁদের কিছু কিছু অধিকার দেন।

প্রায় দু'শো বছর ধরে এই দুই শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব চলার পরে প্লিবিয়ানরা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করেন। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয়

শতাব্দীতে সমস্ত প্লিবিয়ানরা সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করতেন। অভিজাতদের সঙ্গে সমানভাবে রোমান সাধারণতন্ত্রের শাসনকার্যে অংশ নিতেন এবং যৌথ জমিজমারও ভাগ পেতেন। তাছাড়া ঋণদাস প্রথারও উচ্ছেদ হয়েছিল।

তাহলে কি হবে। রোমের সরকারী কাজের বেতন ছিল না, তাই শেষ পর্যন্ত অভিজাতগণ ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে ধনীরাই রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করেন। কেননা গরিবরা কেউ জীবিকা ছেড়ে সরকারী কাজে সময় দিতে পারতেন না। এইভাবে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে কয়েকটি ধনী প্লিবিয়ান ও প্যাট্রিসিয়ান পরিবারের হাতে রোমের সমস্ত ক্ষমতা চলে আসে। তখন থেকেই রোমের রাজ্য জয় আরম্ভ হয়েছিল।

রোমের নাগরিকতা

আদিযুগে রোমের নাগরিক অধিকার মাত্র প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্লিবিয়ানদের নাগরিকের সমস্ত কাজ করতে হলেও কোন অধিকার ছিল না। পরে রাজ্য জয় আরম্ভ হলে ইতালির কোনও কোনও অঞ্চলের লোকেরা রোমের সাহায্য করতেন। তখন তাঁদের সাহায্যের প্রতিদানে "**মিত্র**" বলে স্বীকার করা হত। এঁরা কিছু কিছু অধিকার পেতেন। তারপর দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর প্লিবিয়ান এবং বিদেশীরাও রোমের নাগরিক অধিকার লাভ করেছিল। রোমে বসবাসকারী ব্যক্তিমাত্রকেই রোমান নাগরিকের অধিকার দেবার প্রস্তাব করায় একবার দেশে ভীষণ গণ্ডগোল হয়েছিল। যিনি এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁকে হত্যা করা হয়। অনেক পরে জুলিয়াস সীজারের প্রেরণায় রোমান সাম্রাজ্যের সকলকেই রোমের নাগরিক অধিকার দান করা হয়েছিল।

চতুর্থ পাঠ

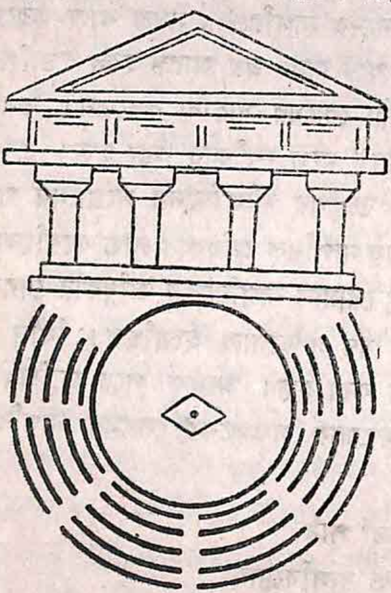
দাসপ্রথা ও দাসবিদ্রোহ

গ্রীসের মতো রোমেও দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। আদিযুগে প্রতি প্যাট্রিসিয়ানদের পরিবারেই ঘর-গৃহস্থালীর কাজের জন্য দাস

থাকতেন। তবে তাঁদের পরিবারেরই লোকের মতো মনে করা হত। আশেপাশের গ্রীক উপনিবেশগুলিতে দাসদের দিয়ে সমাজের উৎপাদনের সব কাজ করানো হত। তাতে কৃষি, কারিগরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত কিছুতেই ব্যয় কম পড়ত। রোম এইসব দেশ জয় করলে সেখানকার লোককে দাস হিসেবে রোমে চালান করে দিতে আরম্ভ করে। তাতে ক্রমেই রোমে দাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে ও তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

ক্রমে ক্রমে দাস-ব্যবসা রোমে উৎপাদনের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে রোমের কারিগরদের যন্ত্রপাতি ছিল খুব সরল। কাজ না জানা লোকেরও তা নিয়ে কাজ করতে অসুবিধা হত না। সুতরাং প্রভুরা দাসদের দিয়ে অতি সহজেই নানা কাজ করিয়ে নিতে লাগলেন।

রোমের রূপার খনিগুলিতে কাজ করতেন প্রায় ৫০,০০০ জন দাস, এক-একটি বিরাট জাহাজে দাঁড় টানতেন প্রায় ২০০ জন দাস। কারখানা, পথঘাট বানানো, গৃহনির্মাণের কাজে দাস-শ্রম নিযুক্ত হত। পূর্বাঞ্চলের দেশে ও গ্রীসে কৃষিতে বেশি দাস কাজ করত না। তবে রোমে অসংখ্য দাস দিয়ে জমিদাররা বিরাট বিরাট জোতজমা চাষবাস করাতেন। জমি চাষ করা থেকে শস্য মাড়াই সবকিছুই তাদের করতে হত।



অ্যাম্ফি থিয়েটার

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাসদের হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হত। শস্য মাড়াইয়ের সময় দাসরা যাতে খিদে পেলে

খেতে না পারে সেজন্য তাদের জামার কলার বেঁধে দেওয়া হত সারা বছর তারা এক বস্ত্রে থাকত। রাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে দাসদের গারদে বন্দী করে রাখা হত। কারণে-অকারণে সর্দারদের চাবুকে তাদের শরীরে রক্তের ধারা বইত।

দাসদের পরস্পরের মধ্যে মল্লযুদ্ধ বাধিয়ে প্রভুরা তা উপভোগ করতেন। অবাধ্য দাসদের ক্ষুধার্ত পশুর মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হত। আর হাজার হাজার লোক সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে আমোদ উপভোগ করত। এসব খেলা হত অ্যাম্ফি থিয়েটারে। যেসব দাসদের দিয়ে মল্লযুদ্ধ করানো হত তাদের নাম ছিল **গ্লাডিয়েটার।**

দাস বিদ্রোহ, স্পার্টাকাস

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে ইতালিতে দাসের সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায়। তারা অসহ্য জীবন সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করে। দাসদের সে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন **স্পার্টাকাস। কাপুয়া** নামে একটি নগরের গারদ থেকে প্রথমে কয়েকজন গ্লাডিয়েটার পালিয়ে যায়। তারা গিয়ে আশ্রয় নেয় বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরির চূড়ার নির্বাপিত গহ্বরের মধ্যে। জংলা আঙুরের ঘন বনে জায়গাটা আচ্ছন্ন ছিল।

দেহের শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য সকলে স্পার্টাকাসকে নেতা নির্বাচিত করে। তিনি ছিলেন বলকান উপদ্বীপের উত্তর অঞ্চলের লোক। রোমানদের হাতে বন্দী হয়ে দাসে পরিণত হয়েছিলেন। দাসদের বিদ্রোহের খবর দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, দেখতে দেখতে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে প্রায় ৭০,০০০ দাসদের এক বিরাট বাহিনী গড়ে উঠল। সে দলে গল, স্পেন, সিরিয়া, ম্যাসিডন প্রভৃতি নানা দেশের দাস ছিল।

এ বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে রোমের সিনেট তাদের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল পাঠালেন। কিন্তু প্রথম কয়েকটি যুদ্ধে তারা স্পার্টাকাসের নিকট পরাজিত হল। তারপর তারা দাসসৈন্যদের খাদ্য সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিল। স্পার্টাকাসের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ হয় খ্রীঃ পূঃ ৭১

অব্দে। সে যুদ্ধে স্পার্টাকাস নিহত হলে দাসদের পরাজয় ঘটে। প্রায় ৬০০০ দাসকে প্রকাশ্য রাজপথে ক্রুশবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে মারা হয়। দাসবিদ্রোহের অবিস্মরণীয় নেতা স্পার্টাকাসকে নিয়ে নানা দেশে নানা কাহিনী রচিত হয়েছে।

পঞ্চম পাঠ

রোম সাধারণতন্ত্রের অবসান

দুই বৎসরের দাস বিদ্রোহে রোম সাধারণতন্ত্রের ভিত কেঁপে উঠেছিল। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা দেখলেন যে, বিশাল সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির সাহায্য ছাড়া রোমের দাসদের শাসনে রাখা সম্ভব নয়। তাঁরা চাইলেন কোনও শক্তিশালী সেনানায়কের হাতে রোমের শাসন-ক্ষমতা তুলে দিতে। সাধারণতন্ত্রের শাসনে আর তাঁদের ভরসা ছিল না।

দাসবিদ্রোহ ছাড়া আরেকটা ঘটনা তখন ঘটেছিল। দীর্ঘ একশ বছর ধরে কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ চলেছিল। সেই যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সবচেয়ে বড় অংশ ছিল ইতালীর কৃষকসমাজ। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে তারা আর চাষবাস করতে চাইল না। তারা মাইনে-করা সৈন্য হিসাবে বিভিন্ন সেনাপতির দলে ভিড়ল। এর ফলে সেনাপতিদের ক্ষমতা গেল বেড়ে। তাঁরা ইচ্ছে করলে সিনেটের সভ্য-দের ভয় দেখিয়ে যা ইচ্ছে আইন-কানুন রচনা করতে পারতেন। প্রকৃত-পক্ষে তখন রোম সাধারণতন্ত্রের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

রোমে তখন শুরু হল বিভিন্ন সেনাপতিদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

শেষ পর্যন্ত সেই সংগ্রামে জয়ী হয়ে রোমকে রক্ষা করলেন **জুলিয়াস সীজার।**

ষষ্ঠ পাঠ

জুলিয়াস সীজার

জুলিয়াস সীজার ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান। যৌবনকাল থেকেই তিনি ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন। তাঁর মতো বাগ্মী তখন রোমে কেউ ছিল না। সৈন্যবাহিনী তাঁর নেতৃত্বে ও বক্তৃতায় অপরাজেয় হয়ে উঠেছিল। সীজার রোমের গরিবদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। তবে নিজের স্বার্থে তাদের কাজে লাগাতে ইতস্তত করেন নি। তাদের হৃদয় জয় করতে তিনি গরিবদের জন্য মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করেন। আর বিনামূল্যে তাদের মধ্যে রুটি বিতরণ করান। এর ফলে গরিবদের ভোটে তিনি কনসাল নির্বাচিত হন ও পরের বছর গল প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।



জুলিয়াস সীজার

৯ বছর ধরে যুদ্ধ করে করে সীজার সমস্ত গল প্রদেশ ও ইংলণ্ড জয় করেন। সেখান থেকে প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করে ও বন্দী দাসদের নিয়ে তিনি নিজের শক্তিবৃদ্ধি করেন। সেই অর্থে তিনি সৈন্যদের বেতন দ্বিগুণ করেন ও তাদের মধ্যে দাস বিতরণ করেন।

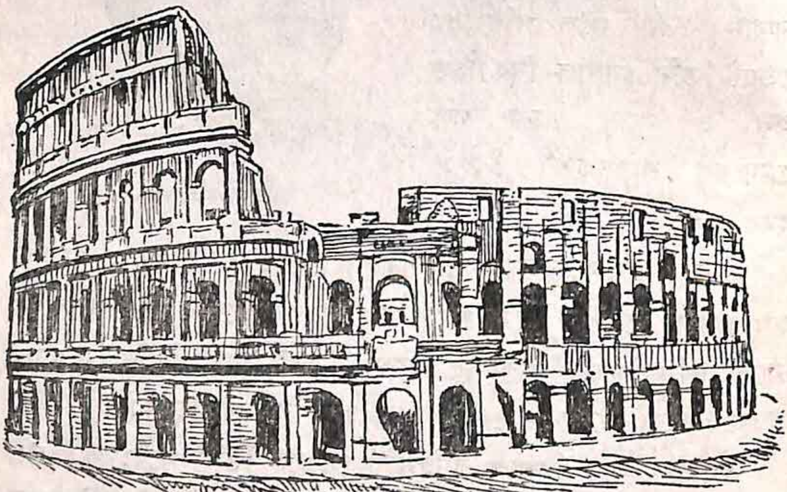
এইভাবে এক বিশাল বাহিনীর নেতৃত্বে তিনি খ্রীঃ পূঃ ৪৯ অব্দে অতর্কিতে রোমে এসে ক্ষমতা দখল করেন। সিনেট তখন তাঁকে আজীবন ডিক্টেটর বা একনায়ক করল। তিনি হলেন সারা ইতালির মুকুটবিহীন সম্রাট। পাছে তিনি সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করে রাজা হয়ে বসেন, এই ভয়ে কয়েকজন তাঁকে হত্যা করে।

কিন্তু সাধারণতন্ত্রী নেতাদের মনের আশা পূর্ণ হয়নি। সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র আর্থ্যাভিয়ান সীজার সাধারণতন্ত্রীদের পরাজিত করে নিজে সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। কাকার অদৃষ্ট দেখে তিনি রাজসিংহাসন লাভ করতে ভরসা পাননি। সাধারণতন্ত্রের সিনেটকে দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সব কাজ করাতেন। সিনেট তাঁকে অগাস্টাস বা 'পবিত্র' আখ্যায় ভূষিত করেন।

সপ্তম পাঠ

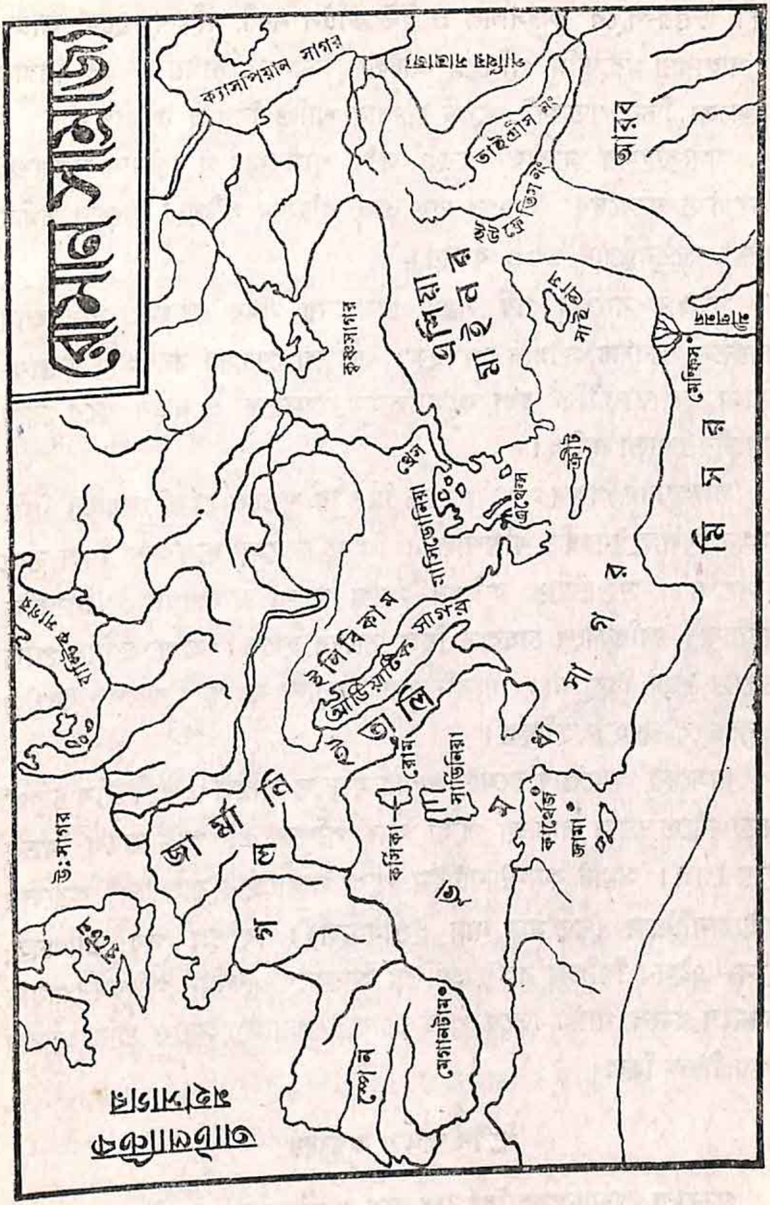
নতুন সাম্রাজ্য

অগাস্টাস ৪১ বছর রাজত্ব করেন। কাকার অসমাপ্ত কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি রোমান প্রদেশগুলিকে সুসংহত করে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙখলা প্রতিষ্ঠা করেন। আর দিগ্বিজয় না



কলোসিয়াম

করে তিনি দেশকে লুণ্ঠন ও দুর্নীতিমুক্ত করেন। তাঁর সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল উত্তরে ইওরোপের রাইন ও ডানিউব


রোম সাম্রাজ্য
ক্যাসপিয়ান সাগর
কৃষ্ণসাগর
টাইগ্রীস নং
ইউফ্রেটিস নং
আরব
এশিয়া মাইনর
সাইপ্রাস
মেম্ফিস
ক্রীট
এথেন্স
ম্যাসিডোনিয়া
গ্রীস
ইলিরিকাম
আড্রিয়াটিক সাগর
ইতালি
রোম
সার্ডিনিয়া
কর্সিকা
কার্থেজ
জামা
ভূমধ্য সাগর
জার্মানি
গল
স্পেন
বাল্টিক সাগর
উঃ সাগর

নদী, উত্তর-পূর্বে কৃষ্ণসাগর ও ইউফ্রেটিস নদী, দক্ষিণ-পূর্বে আরব ও সাহারার মরুভূমি, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। এই বিরাট সাম্রাজ্যে তিন শতাব্দী জুড়ে রোমান শান্তি বিরাজ করেছে।

অগাস্টাসের মৃত্যুর পরেও তাঁর শাসনব্যবস্থা রোমান সাম্রাজ্যে অনুসৃত হয়েছে। একের পর এক পাঁচজন সীজার বংশের সম্রাট রাজত্ব করেন প্রায় ১০০ বৎসর।

সীজার বংশের পর সম্রাট ট্রাজানের সময় রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছয়। এযুগে রোমের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য স্থাপত্যকীর্তি হল কলোসিয়াম, ফোরাম ও নতুন করে রোম নগরীর শোভা বৃদ্ধি।

সাম্রাজ্যের পতন : খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে রোম সাম্রাজ্য ছিল যেমন বিশাল তেমনি শক্তিশালী। কিন্তু রোমের দুর্বলতা ছিল তার দাসপ্রথা। সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাসপ্রথারও বিস্তৃতি ঘটছিল। অধিকাংশ চাষবাস ছিল তাদের হাতে। অথচ জমির প্রতি তাদের দরদ ছিল না। দাসনির্ভর উৎপাদন-ব্যবস্থায় দেশের উন্নতি নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছিল।

দাসদের অসন্তোষ ক্রমেই আবার বাড়তে লাগল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সম্রাট কনস্ট্যানটাইন পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী করলেন বাইজেনটিয়াম (বর্তমান নাম ইস্তামবুল)। বিভিন্ন গথ, ভ্যান্ডাল, হুন—এইসব বিভিন্ন বর্বর জাতির আক্রমণে একদিন পশ্চিম-রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস পায়। তবে পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য আরও প্রায় হাজার বছর টিকে ছিল।

খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়

প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাস ও গরিবদের সব বিদ্রোহ একের পর এক দমন হচ্ছিল। তখন তাদের মনে মুক্তির আর কোন আশা

রইল না। ভগবানের দয়ায় তাদের বিশ্বাস কমে গেল। সেই সময় লোকের মুখে মুখে রটে গেল যে একজন মানুষের বেশে ভগবান প্যালেস্টাইনে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর নাম যীশু খ্রীষ্ট। তাঁকে এক রোমান শাসক ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছেন। তবে তিনি হাসিমুখে সব অত্যাচার সহ্য করে সবাইকে ভরসা দিয়েছেন যে, শীঘ্রই পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন।



যীশু খ্রীষ্ট

অগাস্টাস তখন রোমের সম্রাট। সুদূর প্যালেস্টাইনের জুডিয়া প্রদেশের এক দরিদ্র ইহুদীর ঘরে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের কথা দৈববাণীতে নানা লোকে জানতে পারে।

দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন বলে সাধারণ ছেলেদের মতো বিদ্যালয়ের পড়াশুনা তাঁর হয়নি। ছেলেবেলা থেকে তিনি চিন্তাশীল প্রকৃতির ছিলেন। ইহুদীদের মধ্যে ধর্মের কুসংস্কার তাঁর মনকে পীড়া দিত। তিনি ত্রিশ বছর বয়সে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রচার আরম্ভ করেন।

তাঁর চরিত্রের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেক গরিব ও নিম্নশ্রেণীর লোক তাঁর শিষ্য হল। শিষ্যেরা প্রচার করলেন যে, ইনি হচ্ছেন ইহুদীদের মুক্তিদাতা। যীশু প্রচার করলেন যে, শীঘ্রই পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই রাজ্যে দরিদ্র ও নিপীড়িতরা সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদায় বাস করবেন।

যীশুর জনপ্রিয়তা যত বাড়ছিল ততই ইহুদী পুরোহিতদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। সেজন্য তারা চক্রান্ত করে ধর্ম, রাজদ্রোহের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করায়।

যীশুর শিক্ষার মূলকথা হচ্ছে মানুষ মাত্রেই ভাই-ভাই। ভগবান পরম দয়ালু। তাঁর চোখে পাপী-তাপীর কোনও ভেদাভেদ নেই। পাপীরাও অনুতপ্ত হলে মুক্তিলাভের অধিকারী। তাঁর ধর্মের প্রধান বাণী হল—ভালোবাসা। তিনি শত্রুকেও ভালোবাসতে বলেন।

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর বাণী বারোজন শিষ্য চারিদিকে প্রচার করে। প্রথম প্রথম তাঁদের উপর রোমান শাসক ও প্রভুরা অকথ্য অত্যাচার করত। ৩৩৭ খ্রীঃ সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তখন থেকে খ্রীষ্টধর্ম দ্রুত পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়।

অনুশীলনী

প্রবন্ধধরনের প্রশ্ন ঃ

১। পিউনিক যুদ্ধ কার কার সঙ্গে হয়েছিল? তিনটি পিউনিক যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

২। রোমান সমাজে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের পরিচয় দাও। এদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

৩। রোমের দাসপ্রথা ও দাসবিদ্রোহের বিষয় একটি প্রবন্ধ রচনা কর। সেই প্রসঙ্গে দাস বিদ্রোহের নেতা স্পার্টাকাসের ভূমিকা দেখাও।

৪। রোমের সাধারণতন্ত্রের অবসান হল কাদের হাতে? তাদের সময় নতুন সাম্রাজ্য কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

৫। খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয় এবং যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। রোমের সৃষ্টি নিয়ে কি কিংবদন্তী আছে?

২। স্পার্টাকাস কে ছিলেন? তার বিষয় কি জান?

৩। যীশু যে ধর্ম প্রচার করেন তা কোন্ সম্রাট গ্রহণ করেছিলেন?

৪। জুলিয়াস সীজার কে ছিলেন?

বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন ঃ

[হ্যা কি না '√' কিংবা '×' চিহ্ন দিয়ে দেখাও]

১। ১৯৬০ সালে রোমে অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়......

২। অ্যাম্ফি থিয়েটারে নাটক মঞ্চস্থ করা হত .....

৩। জুলিয়াস সীজার গরীবের সন্তান ছিলেন......

৪। যীশুর শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে মানুষ মাত্রেই ভাই-ভাই......

অষ্টম অধ্যায়

লৌহযুগের চীনের ইতিকথা

প্রথম পাঠ

মহান সাঙ্

লৌহযুগের চীনের ইতিকথার আরম্ভ প্রকৃতপক্ষে সাঙ্ বংশের রাজত্বের পরে। তখন চৌ রাজবংশ চীন শাসন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল আরও পূর্বের সাঙ্ যুগেই। সেই সাঙ্ যুগের এক প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর জীবনী ও কৃতিত্বের কথা বিশদভাবে আলোচিত হবে।

এই মনীষীই সাঙ্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মহান সাঙ্ নামে পরিচিত। তিনি পূর্ববর্তী অত্যাচারী রাজাকে উৎখাত করে চীনে প্রজাহিতৈষী শাসন প্রবর্তন করেছিলেন।

তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল প্রজাদের হিতসাধনের চেষ্টা। নিজের মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি প্রজাদের সদাচারের শিক্ষা দান করতেন। তিনি সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দেন যে তাঁর উপদেশ শুনে চললে যদি প্রজাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়তো তিনি নিজে তার দায়িত্ব বহন করবেন।

এবিষয়ে একটি মনোজ্ঞ কিংবদন্তিও রয়েছে। কথিত আছে একদা তাঁর রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। রাজার পাপেই প্রজাদের জীবনে এই অভিশাপ ঘটেছে বলে তাঁর ধারণা জন্মায়। সেজন্য তিনি দেবতার পায়ে আত্মবলি দিয়ে নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে দেবতা তাঁকে আত্মবলিদান থেকে বিরত করেছিলেন।

প্রজাদের কল্যাণে এত বড়ো আত্মত্যাগের উদাহরণ সারা পৃথিবীতেই বিরল। সেজন্য তিনি কিংবদন্তির মহান পুরুষরূপে আজও শ্রদ্ধালাভ করছেন।

কনফুসিয়াসের বাণী

চীনের চৌ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ মানব কনফুসিয়াস। তাঁরই প্রেরণায় ও শিক্ষায় চীনের জনগণ স্বদেশে এক শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সভ্যতা গড়ে তুলছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন উত্তর চীনের লু রাজ্যের একজন সামান্য রাজকর্মচারী। তাঁর তিন বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়েছিল। পরিবারটি অত্যন্ত দরিদ্র ছিল বলে বাল্যকাল থেকেই কনফুসিয়াসকে স্বাবলম্বী ও কঠোর পরিশ্রমী হতে হয়েছিল। ১৮ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ও তার পর তিনি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নানা চাকুরি করেন। কাজ করবার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে চৌ বংশের রাজত্বকালে বড়ো বড়ো জমিদাররা নানাভাবে প্রজাদের উৎপীড়ন করেন।



কনফুসিয়াস

এসব দুর্নীতি দূর করার জন্য তিনি ২২ বৎসর বয়সে একটি আশ্রম খুলে তরুণদের সদাচারের বিষয় শিক্ষা দেন। অল্পদিনের মধ্যেই চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল এইভাবে জ্ঞান বিতরণের পরে লু রাজা তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দান করেন। তাঁর পরিচালনায় লু-রাজ্য একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রজাদের উপর সকল উৎপীড়ন তিনি বন্ধ করে দেন। এতে অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে উঠে এবং তাঁদের প্ররোচনায় কনফুসিয়াসকে পদত্যাগ করতে হয়।

তিনি প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্যকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন—প্রজার কর্তব্য, স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য, বড়ো ও ছোটো ভাইদের কর্তব্য

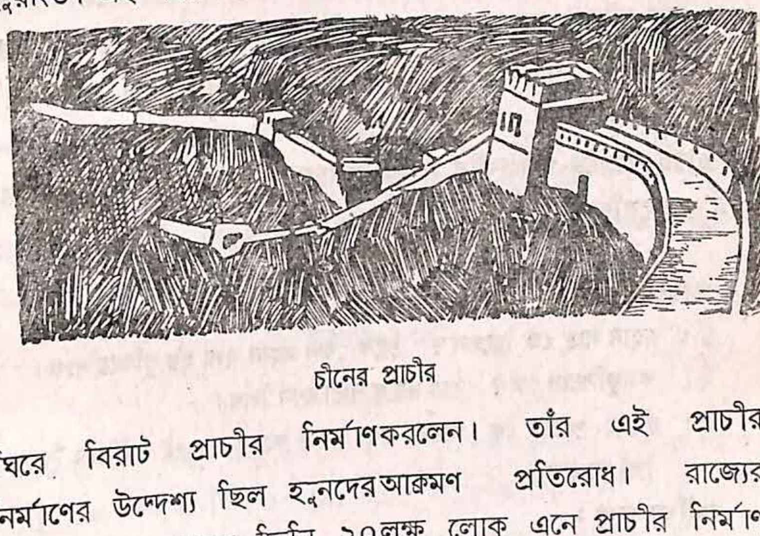
এবং বন্ধুদের কর্তব্য। সদাচরণই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল কথা। আর ছিল অতীতের ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

দ্বিতীয় পাঠ

চীনের আশ্চর্য প্রাচীর

খ্রীঃ-পূঃ প্রথম সহস্রাব্দে চীনে অসংখ্য বড়ো বড়ো নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব নগরের রাজারা যাযাবরদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নগরগুলির চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করাতেন।

যখন চীনে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন সম্রাট সী হুয়াংতী এই সময় বিচ্ছিন্ন প্রাচীরগুলিকে যুক্ত করে সমস্ত সাম্রাজ্য



চীনের প্রাচীর

ঘিরে বিরাট প্রাচীর নির্মাণকরলেন। তাঁর এই প্রাচীর নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল হুনদের আক্রমণ প্রতিরোধ। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিনি ২০লক্ষ লোক এনে প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন। সী হুয়াংতীর রাজত্বের পরেও এর কাজ চলেছিল।

প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ২৫০০ মাইল। এটি এত প্রশস্ত যে ৫-৬ জন ঘোড়সওয়ার পূর্ণ বেগে এর ওপর দিয়ে ধাবিত হতে পারত। এই প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করতে না পেরেই হূন অভিযাত্রীরা ইউরোপ

ও ভারতে অভিযান চালিয়েছিল। প্রাচীরটির পাশ দিয়েই তিনি নির্মাণ করেছিলেন বেরাম সড়ক। ভারত ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে এটাই কালক্রমে প্রধান বাণিজ্যপথ হয়ে উঠেছিল।

চীন সাম্রাজ্য

খ্রীঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দে চীনে সাতটি রাজ্য ছিল। কালক্রমে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় চীন রাজ্য প্রাধান্য অর্জন করে। তাঁদের ঐশ্বর্যেরও শেষ ছিল না। চীন রাজবংশের রাজারা নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। লৌহযুগের তরবারি দিয়ে তাঁরা সহজেই অন্যসব রাষ্ট্রের ব্রোঞ্জের অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। শক্তি ও বুদ্ধির জোরে চীন রাজ্যের রাজা একে একে চীনের সমস্ত রাজ্য জয় করে নিলেন। সারা চীন-জুড়ে বিরাট ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এর প্রতিষ্ঠাতা 'চীন সী হুয়াংতী' নাম গ্রহণ করলেন, অর্থাৎ ''চীনের প্রথম সম্রাট''।

এঁরই রাজত্বে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি 'চীনের প্রাচীর' নির্মিত হয়েছিল।

অনুশীলনী

প্রবন্ধধরণের প্রশ্ন :

১। মহান সাঙ্ কে ছিলেন ? তাঁকে কেন মহান বলা হয় বুঝিয়ে দাও।

২। কনফুসিয়াস কে ? তার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। চীনের প্রাচীর কে করেন এবং কেন করেন ? এই প্রাচীরের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। খ্রীঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দে চীনে কয়টি রাজ্য ছিল ?

২। কোন্ সম্রাট চীনের প্রাচীর গড়েছিলেন ?

বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন :

[হ্যা কি না '√' কিংবা '×' চিহ্ন দিয়ে দেখাও]

১। চীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম সীহুয়াংতী ... ...

২। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি হল চীনের প্রাচীর ... ...

নবম অধ্যায়

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস

প্রথম পাঠ

আর্যদের ভারতে আগমন

মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সভ্যতার অনেক পরে লৌহযুগে ভারতে এক নতুন জাতির আগমন হয়েছিল। এরা আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক। এঁরা বাস করতেন ইরানের উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে।

পাঞ্জাবের যেখানে তাদের প্রথম বসতি হয় তার নাম **সপ্তসিন্ধু**। সাতটা নদীতে জায়গাটা ঘেরা ছিল বলে ঐ নাম হয়েছিল। তারপর এদের কেউ কেউ দক্ষিণ-পূর্বে দিল্লীর কাছাকাছি বাস আরম্ভ করে। আর্যদের কথা আমরা জেনেছি তাঁদের রচিত সাহিত্য থেকে।

ভারতে আর্যদের আগমনকাল আন্দাজ করা হয় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ। এর প্রমাণও আছে তুরস্কের অধীন **বোখাজকোই** নামে একটা শিলালিপিতে। আর্যরা সবাই এক সঙ্গে আসেন নি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে এসেছেন। সেজন্য নিজেদের মধ্যে জমি-জায়গা নিয়ে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহও করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ

চতুর্বেদ

পাঞ্জাবের সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিরাজ করে। পশুচারক আর্যজাতি সেখানে এসে মুখে মুখে নানা কাব্য গাথা ইত্যাদি রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে তখনো লিপির প্রচলন হয়নি বলে সে-সব কাব্য মুখে মুখে ফিরত বংশপরম্পরায়। এ-সমস্ত কাব্যে ভগবানের স্তবস্তোত্র আছে তেমনি আছে নিজেদের বিষয়েও নানা কাহিনী। আর্যদের জীবনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে চারটি বেদ রচিত হয়।

চারটি বেদের মধ্যে সর্বপ্রথম রচিত হয়েছিল **ঋক্‌বেদ**। এতে আছে ভগবানের স্তবস্তোত্র। ১০২৮টি শ্লোকে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। বিভিন্ন কুলের নানা ঋষির রচিত শ্লোক এতে আছে। ঋক্‌বেদ থেকে সেযুগের আর্যদের জীবনধারার সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক—দুটি বিষয়েই ধারণা জন্মে। এই বেদেই আছে কী ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রকে কেন্দ্র করে।

ঋগ্বেদের পরে রচিত হয় **সামবেদ**। সামবেদ নতুন বেদ নয়। ঋগ্বেদেরই স্তবস্তুতির মধ্যে যেগুলি সামবেদের সময় গান করা হত তাই একত্রিত করে এটি রচিত। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বেদের মধ্যে সামবেদকেই প্রধান বলেছেন।

এরপরে যাগযজ্ঞের মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে রচিত হয়েছে **যজুর্বেদ**। যজুর্বেদেই আছে যাগযজ্ঞের বেদী, অনুষ্ঠান, আচরণ সব কী রকম হবে। অনেকের মতে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠনগুলির মধ্যে দিয়ে আর্যরা তাঁদের অতীত, পুরাতন ও নবপ্রস্তর যুগের স্মৃতি জাগিয়ে রাখতেন।

সকলের শেষে রচিত হয় **অথর্ববেদ**। এই বেদে চিকিৎসাবিধি, তুকতাক, যাদু এবং আরও নানা জিনিস আছে। সেযুগের মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনধারার একটা পরিচয় পাওয়া যায় অথর্ববেদ থেকে।

তৃতীয় পাঠ

আর্যদের সমাজজীবন ও ধর্ম

ঋগ্বেদ থেকেই আমরা আর্যদের সমাজজীবনের পরিচয় পাই। আর্যরা এদেশে প্রথম এলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এঁদের আর্যরা দস্যু নাম দিয়েছিলেন।

আর্যদের নিজেদের মধ্যেও প্রথমে তিনটে বিভাগ ছিল। সেই বিভাগ হয়েছিল গুণ ও কাজ অনুসারে। পূজা-আর্চার কাজ যাঁরা করতেন তাঁরা ছিলেন **ব্রাহ্মণ**। যুদ্ধবিগ্রহের কাজে ব্যস্ত লোকদের নাম হল **ক্ষত্রিয়**, এবং কারিগরি, কৃষিকাজ নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত রইলেন তাঁরা

হলেন **বৈশ্য**। পরে আর্যদের মধ্যে যাঁরা পতিত হতেন ও অন্য আর্যগোষ্ঠীর দাসদের নিয়ে গঠিত হয় **শূদ্র** শ্রেণী। তাদের কাজ ছিল অন্যদের সেবা করা।

লৌহ আবিষ্কার করে ও ঘোড়ার ব্যবসা করে আর্যরা সহজেই রাজ্য বিস্তার করতে পারছিলেন। কর্মকারদের কাজের এখন নতুন ধাতু হল লোহা।

আর্যদের বেশভূষা হরপ্পা সভ্যতার চেয়ে খুব ভিন্ন ছিল না। উপরে পরতেন **উত্তরীয়** আর নিম্নাঙ্গে থাকত **অন্তরীয়**। আর্যরা খুব অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। আর্যদের প্রধান আমোদ ছিল রথ-চালনা আর বাজী রেখে পাশাখেলা। নাচগানও তাঁদের প্রিয় ছিল। আর্যরা প্রচুর দুধ, ঘি, মাখন খেতেন। ফল, সবজি, দানাদার শস্য এবং মাংসও যথেষ্ট খেতেন। মধু এবং সুরা ছিল পানীয়। যজ্ঞের সময় সোমরস পানের প্রথা ছিল।

আর্যদের পরিবারে পিতা বা প্রবীণতম ব্যক্তি ছিলেন প্রধান। মেয়েদের মর্যাদা দান করা হত। অনেক মেয়ে শিক্ষাও পেতেন।

ধর্মঃ আর্যরা প্রকৃতির নানা শক্তির পূজা করতেন। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, নক্ষত্র, বায়ু, বৃক্ষলতা, নদী, পর্বত, সমস্ত কিছুই ছিল তাঁদের কাছে দেবদেবীর মতো। আকাশ দেবতা ছিলেন **দৌস্‌পিতর** ; ইন্দ্র বজ্র, ঝড় আর বৃষ্টি এবং যুদ্ধের দেবতা, সূর্য ছিলেন সূর্যদেব ; অগ্নি আগুনের দেবতা আর ঊষা ভোরের দেবী। ঋগ্বেদে ঊষা দেবীর অপূর্ব বন্দনা আছে। এঁদের মধ্যে ইন্দ্র ছিলেন দেবরাজ।

আর্যদের বিশ্বাস ছিল যে যাগযজ্ঞ দিয়ে দেবদেবীকে তুষ্ট রাখতে হয়। সেজন্য যজ্ঞের বিশাল আয়োজন করা হত।

তবে দেশের সকলেই যাগযজ্ঞের বিশাল ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। এঁরা যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন তুললেন। তাঁরা বনে গিয়ে তপস্যা করতেন। এঁদের আলোচনার বিষয় বেদের একটি অংশ উপনিষদে আছে। এইসব গুরুদের ঋষি বলা হত।

চতুর্থ পাঠ

আর্যদের রাজনৈতিক জীবন

আর্যদের নানা কুল বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। এক-একটি কুল নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করত। এঁদের পরস্পরের মধ্যে পশুচারণের জমি নিয়ে যুদ্ধ লেগে থাকত। সেসব যুদ্ধে নেতৃত্ব করার জন্য কুলের সবচেয়ে বলশালী ও বুদ্ধিমান এবং নির্ভীক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হত। তিনি হতেন নেতা, আর্যরা এঁকে রাজা বলতেন। প্রথম প্রথম রাজার পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। পরে রাজপদ বংশানুক্রমিক হয়েছিল।

রাজাকুলের লোকেরা ইচ্ছানুসারেই শাসন করতেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য রাজকর্মচারীও ছিলেন। রাজার ধর্মকর্ম ও রাজকার্যে পরামর্শ দেবার জন্য একজন পুরোহিত থাকতেন। আর দূর দূর গ্রামে রাজার আদেশ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ছিলেন দূত।

গ্রামগুলির প্রধানদের গ্রামনী বলা হত। রাজাকে গ্রামনীদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হত। তবে যদি খুব জরুরী বিষয় থাকত তাহলে রাজা কুলের সমস্ত লোকের মতামত নিতেন। কুলের লোকের দু-ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল — **সভা ও সমিতি**। সমিতিতে কুলের সমস্ত লোকই নিজের মতামত জানাতে পারতেন। কিন্তু সভা ছিল ছোটো— শুধুমাত্র প্রবীণদের প্রতিষ্ঠান।

পঞ্চম পাঠ

দুটি মহাকাব্যঃ রামায়ণ ও মহাভারত

হোমারের গ্রীসের মতো ভারতেও আর্যগণ দুখানি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তার একটি ছিল **রামায়ণ**। মহর্ষি বাল্মীকি নানা কিংবদন্তি ও গাথা থেকে সংগ্রহ করে ইক্ষ্বাকু বংশের রামচন্দ্রের জীবনীকে মহাকাব্যের আকারে রচনা করেছিলেন। হোমারের

ইলিয়াডের মতো রামায়ণেও রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে অপহরণের কাহিনী আছে। পিতৃসত্য পালনের জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতাকে নিয়ে বনবাসে গেলে পঞ্চবটী বন থেকে রাবণ তাঁকে অপহরণ করেন। রামচন্দ্র বিশাল বানরবাহিনীর সহায়তায় রাবণের রাজধানী লঙ্কা আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। তারপর সীতাকে নিয়ে ফিরে আসেন দেশে।

রামায়ণের মধ্যে সে-যুগের আচার-আচরণ, যুদ্ধবিদ্যা, রাজার প্রতি প্রজার, প্রজার প্রতি রাজার আচরণ, পরিবারে বধূর আচরণ, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের আচরণ কেমন ছিল তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। রামচন্দ্রের বনযাত্রা ও বিভিন্ন স্থানে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে জানা যায় যে, ঐসব অঞ্চলে তখন অনার্য প্রভাব ছিল। পরে আর্যদের প্রভাব সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মহাভারত ঃ মহাভারতের আয়তন রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বড়ো। ভারতীয়দের জীবনের প্রায় সর্বদিকের কথা এতে নানা কিংবদন্তির আকারে আছে।

অষ্টাদশ খণ্ডে সমাপ্ত মহাভারত কুরু-পাণ্ডব নামে দুই আর্যকুলের ১৮ দিন যুদ্ধ নিয়ে রচিত। যুদ্ধে কুরুবংশ সবংশে নিহত হয় ও পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে রাজত্ব আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধই আর্যদের কুলের মধ্যে যুদ্ধের একটা বিশিষ্ট পরিচয়।

ষষ্ঠ পাঠ

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়

বৈদিক ধর্মে ক্রমাগত যাগযজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রধান হয়ে ওঠে। তখন চিন্তাশীল ঋষিরা সে-সব আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নিজেদের সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। আচারপ্রধান ধর্মের স্থানে নানা সরল সহজ ধর্মকথা প্রচারিত হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মহাবীর বর্ধমান-প্রচারিত জৈন ও গৌতম বুদ্ধ-প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম।

এই ধর্মদুটি প্রচলিত আর্যধর্ম থেকে এতই পৃথক যে অনেকে এই নূতন ধর্মপ্রচারকে ধর্মমহাবিপ্লব বলেন।

মহাবীর ও জৈনধর্ম

জীবনীঃ মহাবীর ছিলেন লিচ্ছবী বংশের রাজপুত্র। বৈশালী নগরে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে তাঁর জন্ম। প্রচলিত ধর্মের উপর বীতস্পৃহ হয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তারপর নানা স্থানে তপস্যা করে ১২ বছর কঠোর তপস্যার পর 'কৈবল্য' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এই সময় তিনি 'জিন' বা জিতেন্দ্রিয় নামে পরিচিত হন। এই 'জিন' শব্দটি থেকে 'জৈন' কথাটির উদ্ভব হয়েছে। তিনি লোভ, মায়া, মোহ প্রভৃতি সাংসারিক বন্ধনমুক্ত ছিলেন বলে 'নির্গ্রন্থ' নামেও পরিচিত হন।



মহাবীর

কৈবল্য জ্ঞানলাভের পর প্রায় ত্রিশ বৎসর তিনি বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাঢ় অঞ্চলে নিজ ধর্মমত প্রচার করেন। খ্রীঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে পাটনার নিকটে পাবা নগরে বর্ধমান মহাবীর দেহরক্ষা করেন। তিনি তাঁর পূর্বের ২৩ জন তীর্থংকরের প্রদর্শিত পথকে সমর্থন করেন। সেই সঙ্গে নিজেও কয়েকটি মত তাঁদের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর ধর্মের নাম **জৈনধর্ম**।

বাণীঃ তিনি বলেছিলেন, বেদের এত আচার-অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞের কোন প্রয়োজন নেই। ভগবানকে ডেকে কিছু হবে না। নিজে সৎপথে থেকে সদাচরণ করলে তবেই আসবে মুক্তি। সেজন্য

দরকার—সত্য বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান, সত্য কর্ম। আত্মার মুক্তির জন্য এই তিন পন্থাকে "ত্রিরত্ন" বলে। এই ত্রিরত্নের অনুসরণ করলে ধর্মজীবন লাভ হবে। জৈনগণ সকল বস্তুতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন। তাই তাঁদের নির্দেশ হল কেউ যেন জীবহিংসা না করেন। এই অহিংসাই জৈনদের মূল ধর্মকথা। ধর্মজীবন যাপন করতে হলে সংসারের কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি রাখা অন্যায়। ধর্মজীবন যাপন করলে মানুষের পুনর্জন্ম হবে না। জৈনধর্মের নিয়ম-কানুন অতি সরল। যে কোন লোকই তা পালন করতে পারেন। জৈনধর্ম প্রচারিত হয়েছিল সাধারণ লোকের মধ্যে। সেজন্য মহাবীর প্রাকৃত ভাষায় সে-ধর্ম প্রচার করেন।

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

জীবনী: বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল শাক্য রাজবংশে। মহাবীরের কয়েক বছর পরে তাঁর আবির্ভাব। নেপাল ও উত্তর প্রদেশের সীমান্তের কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনি উদ্যানে তাঁর জন্ম হয়। মানুষের রোগ, জরা ইত্যাদি দুঃখ দেখে তাঁর মন ব্যথিত হয়। তিনি সংসার ত্যাগ করে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। লোকে বলে তাঁর মতো কঠোর তপস্যা আর কেউ করেন নি। তপস্যার শেষে তিনি সিদ্ধিলাভ করলে তাঁর নাম হয় বুদ্ধ। আর তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয় বৌদ্ধধর্ম।



গৌতম বুদ্ধ

বাণী: বুদ্ধদেবও যাগযজ্ঞ-প্রধান বৈদিক ধর্মের বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধর্মের মূলকথা হলঃ পৃথিবী দুঃখের আসর। মানুষ নিজের কামনা-বাসনার জন্য দুঃখ পায়। অষ্টমার্গ অনুসরণ

করলে মানুষ কামনা-বাসনা জয় করতে পারবেন। সেগুলি অনুসরণ করলে মানুষ ধর্মীয় জীবনযাপন করতে পারবেন। ধার্মিক জীবনের মূল কথা হচ্ছে মিতাচার বা মধ্যপথ। বৌদ্ধধর্মেও জীবহিংসা নিষিদ্ধ। সৎ জীবনযাপন করলে মানুষ নির্বাণ লাভ করবে। তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না। আর্যসমাজের জাতিভেদ প্রথারও তিনি বিরোধী ছিলেন।

প্রভাবঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব বেশি ছিল কারিগর, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে। নতুন নতুন নগরগুলিতে বৈশ্য ও শূদ্রদের সংখ্যা বেশী ছিল বলে সেখানে ধর্ম দুটির প্রসার ছিল বেশি। ধনী ব্যবসায়ীরা বহু অর্থ ব্যয়ে বিহার, মঠ, চৈত্য প্রভৃতি নির্মাণ করে নানা চিত্র ও ভাস্কর্যে সেগুলিকে অলঙ্কৃত করতেন। তাতে ভারতের শিল্পকলা-চর্চারও প্রসারও ঘটেছিল।

বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকরাই পরবর্তী কালে মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রচার করেছিলেন। ভারতে অহিংসা ব্রতের জনপ্রিয়তা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের জন্যই বাড়তে পেরেছে।

সপ্তম পাঠ

সাম্রাজ্যের যুগ

কারিগরি বিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলি নগরের আকার ধারণ করেছে। আর যেসব নগরের অবস্থান ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক সেখানে গড়ে উঠেছে বড়ো বড়ো নগর বা **মহাজনপদ**।

জনপদগুলির মধ্যে কাশী, কোশল, বৎস ও মগধ ছিল প্রধান প্রধান রাজার রাজত্ব। তারপর দীর্ঘকালের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মগধ প্রাধান্য লাভ করে। মগধের প্রাধান্য ঘটেছিল বুদ্ধদেবের সময়ের রাজা **বিম্বিসার** ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর সময়।

তারপরে মগধের রাজত্ব আরও বিস্তৃত হয়েছিল নন্দ বংশের রাজত্বকালে। এই বংশের শেষ রাজা **ধননন্দের** সময় আলেকজান্ডার

ভারত আক্রমণ করেন। ধননন্দ অত্যাচারী ছিলেন। সেজন্য মৌর্য বংশের চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্য দখল করেন।

মৌর্যবংশঃ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে পাঞ্জাবের গ্রীক রাজ্যগুলি চন্দ্রগুপ্ত জয় করেন। সিরিয়ার গ্রীক সম্রাট সেলুকাসকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তারপর পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে পূর্বে কলিঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত আর দক্ষিণে মহীশূরের উত্তর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজসভাতে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস এসেছিলেন।



সম্রাট অশোক

তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র **বিন্দুসার** রাজ্যের সীমানা মহীশূর অবধি বিস্তৃত করেন। এরপর পুত্র অশোক কলিঙ্গ জয় করে সারা ভারতজোড়া বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক যুদ্ধ ত্যাগ করে বিশাল রাজ্যের সুশাসনে মন দেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের মূল কথা বহু শিলালিপির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তিনি বন্ধুত্বের ও একতার কথা প্রচার করতেন। তাঁর স্তম্ভের সিংহমূর্তিই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে।

মৌর্য বংশের পর ভারতঃ নানা কারণে অশোকের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

এই সময় ধারাবাহিক ব্যাকট্রিয় গ্রীক, পার্সীয়, শক ও কুষাণদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। এঁরা সবাই বিদেশী। এঁদের মধ্যে

ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক রাজা মিনন্দার ভারতের বুকে বেশ বড় রাজত্ব গড়েছিলেন। তিনি বৌদ্ধ হন এবং নিজে **মিলিন্দ পন্থ** নামে একটি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন।

এদের পরে আসেন শক ও কুষাণ। তাঁদের মধ্যে কুষাণগণই মধ্য এশিয়া ও ভারত জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। সে সাম্রাজ্য গড়েছিলেন **কণিষ্ক**। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিল। কণিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়ায় ও চীনে প্রচার করেন।

এ সময়ে ভারতের সংস্কৃতি বিদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। গ্রীকদের প্রভাবে গান্ধার অঞ্চলে গড়ে ওঠে গান্ধার শিল্পরীতি। আর দেশীয় শিল্পরীতি দেখা দেয় মথুরায়। এই দুই সম্প্রদায়ই বৌদ্ধ জীবনধারার চিত্র ও ভাস্কর্য রূপ দিয়েছেন। বিদেশী আক্রমণকারীরা কালে কালে সকলেই ভারতের সমাজভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতের মধ্যে এই সময় রাজনৈতিক ঐক্য না থাকায় বৈদেশিক আক্রমণের সুযোগ এসেছিল। এর পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হলে ভারতে আবার রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ফলে ভারত থেকে বিদেশী শাসন উচ্ছেদ হয়েছিল। এই যুগে ভারতের জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। সেজন্য এ যুগকে বলে **'ভারতের সুবর্ণ যুগ'**।



কণিষ্ক

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলে এই বংশ প্রথম খ্যাতিলাভ করে। পরে তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সারা উত্তর ভারত নিজ অধিকারে আনেন। তারপর দাক্ষিণাত্যেরও বহু রাজাকে তিনি পরাজিত করেন। তবে তাদের রাজত্ব দখল করেননি। সেইজন্য তাঁর সাম্রাজ্য মৌর্যদের চেয়ে ছোটো ছিল। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যসীমা আরও বাড়িয়েছিলেন। ভারতের বুক থেকে শেষ বিদেশী শক রাজ্য তিনি উৎখাত করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সভায় ছিলেন কালিদাস প্রমুখ নবরত্ন।



সমুদ্রগুপ্ত

পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে দুর্বল বংশধরদের সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটে। তখন চীন থেকে বিতাড়িত হুনদের একটি শাখা গুপ্ত বংশ ধ্বংস করে। কালক্রমে এঁরাও ভারতের সমাজভুক্ত হয়েছিলেন।

অষ্টম পাঠ

প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস

এ পর্যন্ত যে-সব যুগের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে সে-যুগের বাঙলার ইতিহাসের প্রাথমিক উদাহরণ খুব কমই আছে। সম্প্রতি চন্দ্রকেতুগড়, অজয় নদীর অববাহিকায় পুরা ও নব প্রস্তর যুগের এবং তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের কিছু কিছু নিদর্শন মিলেছে। তা থেকে দেখা যায় যে, আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্ব থেকেই বাঙলায় এক সভ্য জাতির আবাস ছিল। বাঙলা জুড়ে তখন ছোটো-বড়ো নানা জনপদের রাজত্ব ছিল। বাঙালীদের জীবনের দৈনন্দিন আচার-আচরণ সেই আদিম যুগের সভ্যতার দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

আর্যদের বসতি বিস্তারের সময় বাঙলা ছিল অজ্ঞাত রাজ্য। তবে এর প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি জনপদের খ্যাতি সারা ভারতে ছিল। এদেশের লোকজন আর্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে প্রথম প্রথম আর্যরা বাঙলীদের দস্যু ও পতিত বলতেন। ঋগ্বেদের যুগে বাঙলার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বৈদিক যুগ শেষ হলে **ঐতরেয় ব্রাহ্মণ** ও **বোধায়ন সূত্রে** এবং **মনুসংহিতায়** বাঙালীদের দস্যু ও পতিত বলা হয়েছে। তবে মহাভারতের যুগে বাঙলার রাজাদের উল্লেখ দেখা যায়। এরপরে ধর্ম মহাবিপ্লবের যুগেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে বাঙলার বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের উল্লেখ দেখা যায়। তারপরে আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক গ্রীক লেখকদের গ্রন্থে ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে গাঙ্গারিডই নামে এক শক্তিশালী রাজ্যের উল্লেখ আছে। এদের বিরাট হস্তীবাহিনীর কথাও আছে।

মৌর্যযুগে বাংলার একাংশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশেষত সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত দিয়েই তখন পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলত। গুপ্তযুগে সমগ্র বাঙলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন ছিল গুপ্তদের একটি শাসনবিভাগ।

বাঙলাদেশ তখন কয়েকটি স্ব স্ব প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। সেগুলি হল বঙ্গ, পুণ্ড্র, সমতট, হরিকেল, গৌড়, সুহ্ম ও চন্দ্রদ্বীপ। কালক্রমে গৌড় এই সমস্ত জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রধান হয়ে উঠেছিল।

জীবনধারা: বাংলার জীবনধারায় আর্য প্রভাব ছিল না। এখানে প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। কারিগরি, নৌবিদ্যা, চর্মশিল্প, হাতির দাঁতের কাজ, অলংকার ইত্যাদির জন্য বাঙলা বিখ্যাত ছিল। অর্থশাস্ত্রে বাঙলার নানা শিল্পকার্যের উল্লেখ আছে। তারমধ্যে অন্যতম হল রেশমশিল্প। বাঙলার রেশম বস্ত্র রং করতে হত না। রঙীন রেশমই এখানে উৎপন্ন হত। বাঙলার সূক্ষ্ম মসলিনের সুনাম

দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙলার বিভিন্ন জনপদে রাজার শাসন প্রচলিত ছিল। বাঙালী হস্তীচিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল।

নবম পাঠ

বৈদেশিক সম্পর্ক

আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলে গ্রীসের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শ লাভ ঘটে। তার ফলে ভারত ও গ্রীস উভয় পক্ষেরই লাভ হয়েছিল।

পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘনিষ্ঠ হয় ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের যুগে। তখন, বিশেষ করে কুষাণ যুগে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণী ব্যাপকভাবে খোটান, কাশগর প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। এগুলি অনেকটা গ্রীক উপনিবেশের মতো ছিল। সেখানে ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পের মিশ্রণে সৃষ্ট গান্ধার শিল্পরীতির ব্যাপক প্রচার ছিল। সেখান থেকে ভারতীয় শিল্পরীতি চীনের শিল্পধারাকে প্রভাবিত করেছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছিল মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমত।

চীনের বিরাট প্রাচীরের আড়ালে নির্মিত রেশমপথ ভারত ও মধ্য-এশিয়া এবং মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্রে ভারতের সঙ্গে এইসব দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। পরবর্তী কালে খোটান কাশগর অঞ্চলে খননকার্যের সময় সেখানে সম্পূর্ণ ভারতীয় নগরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতীয় বণিকেরা পারস্য, আরব ও মিশরের সঙ্গেও ব্যবসাবাণিজ্য চালাতেন।

পূর্বাঞ্চলে সম্রাট অশোক সর্বপ্রথম লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেছিলেন। তারপর বহু ভারতীয়

ব্যবসায়ী ইউরোপের মশলার চাহিদা মেটাবার জন্য ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করেছেন। এসব দেশের উপকূল অঞ্চলের নগরগুলিতেই ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হত।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ

মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা

ভারতের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটক এসেছিলেন। এঁদের কেউ এসেছিলেন রাজকার্যে দূত হিসেবে, নয়তো ধর্ম-জিজ্ঞাসার জন্যে। এঁদের লিখিত ভ্রমণ-বিবরণ থেকে সে-যুগের ভারতের সমাজজীবনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্যযুগের ইতিহাসের প্রামাণিক উপাদান মৌর্য রাজসভার গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ। মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-বিবরণ গ্রীক ভাষায় রচিত। তিনি সিরিয়ার সম্রাট সেলুকাস নিকাটরের দূতরূপে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় এসেছিলেন। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। এটি **'ইণ্ডিকা'** নামক গ্রন্থে সংকলিত।

রাজধানীঃ মৌর্য রাজধানী ছিল প্রাচীরে ঘেরা বিশাল ও মনোরম। রাজার প্রাসাদ পাথরে তৈরি। অন্য সব বাড়িঘর কাঠের। রাজার বিলাসিতা ও আড়ম্বর এবং রাজদরবারের জাঁকজমক দেখে তিনি বিস্মিত হন।

সমাজঃ মেগাস্থিনিস বলেন যে সমাজের অধিকাংশ ছিলেন কৃষক। হয় তারা নিজেদের জমি চাষ করতেন নয়তো রাজার জমি চষে দিতেন। গ্রামে তাঁরা সুখেই বসবাস করত। রাখাল ও মেষপালক গ্রামে থাকত। তাঁতী, ছুতার মিস্ত্রী, কামার, কুমার প্রভৃতি কারিগরেরা নগরে বাস করত। এদের অনেকে সরাসরি রাজার পক্ষে কাজ করত, আবার অনেকের ছিল স্বাধীন কাজ। সাধারণ লোকেদের মধ্যে তাঁরা

সে-জিনিস কেনাবেচা করতেন। ব্যবসার খুব বিস্তার ছিল। সওদাগরেরা দেশের সব অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন।

সৈন্যদলে অসংখ্য লোক কাজ করত। তাদের বেতন ভালো ছিল এবং তারা থাকত বেশ আরামে। উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মন্ত্রী, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং অন্যেরা নগর ও গ্রাম দু-জায়গাতেই কাজ করতেন। কৃষক, কারিগরদের তুলনায় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল কম। তবে সকলেই তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা কোন কর দিতেন না।

চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালের বিবরণ যেমন মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-কাহিনী থেকে পেয়েছি, তেমনি গুপ্তযুগের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী জানতে পেরেছি চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে।

তিনি ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গোবি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে মধ্য-এশিয়া পার হয়ে ভারতে এসেছিলেন। প্রায় দশ বৎসর তিনি ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠে ধর্ম আলোচনা করে বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে চীনে ফিরে যান। দেশে ফিরে তিনি ভারত ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখেছিলেন।

তিনি লিখেছেন যে গুপ্তযুগে ধর্ম নিয়ে মারামারি ছিল না। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধরা পাশাপাশি শান্তিতে বাস করতেন। ভারতের জনগণ ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত বিবরণ লিখেছেন। লোকজন শান্তিপ্রিয়, আইনমান্যকারী ও সৎ ছিল। আইন ও শাস্তি দুইই ছিল মৃদু। তাঁর মতে মধ্য দেশের অধিকাংশ লোক নিরামিষাশী ছিলেন। তবে সমাজের বাইরের চণ্ডাল প্রভৃতি মাংস, পেঁয়াজ ইত্যাদি খেত। সমাজে তখন জাতিভেদ ছিল, তবে বিভিন্ন জাতের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল না।

ব্যবসাবাণিজ্য বেড়ে যাচ্ছিল বলে নগরের সংখ্যাও বাড়ছিল। গুপ্তযুগে ভারত ও ভারতের বাইরে পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়াতে বেশ ভালো ব্যবসা হত। দেশের ভিতরের বাণিজ্যও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। নৌবিদ্যা ও জাহাজ নির্মাণের উন্নতি হয়েছিল।

নবম পাঠ

ভারতের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব

গুপ্তযুগকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। তার কারণ গুপ্তযুগেই ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদির চরম বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এসব কৃতিত্ব কোন একটি বিশেষ যুগের নয়। ঋগ্বেদের যুগ থেকেই এসব কৃতিত্বের ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

শিল্প ও স্থাপত্যঃ সিন্ধু-সভ্যতা বিকাশের এক হাজার বছরের মধ্যে ভারতে শিল্পস্থাপত্যের কোনই বিকাশ ঘটেনি। মৌর্যযুগে ইরানের প্রভাব এবং বিদেশী শাসকদের যুগে গ্রীক প্রভাব ভারতের শিল্পস্থাপত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অশোকের স্তূপ, বিহার ও চৈত্য গঠনের মধ্যে উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় মেলে। আর এইসব ধর্মকেন্দ্রগুলির দেওয়ালে বুদ্ধের জীবন ও বাণীর চিত্ররূপ থেকে শিল্পকর্মের বিকাশ আরম্ভ হয়। এই সময়েই পাহাড় কেটে অজন্তা গুহার দেওয়ালে প্রথম চিত্রলিপি রচনা আরম্ভ হয়েছিল। কণিষ্কের যুগে গ্রীক ও রোমান ভাস্কর্যের প্রভাবে এদেশে **গান্ধার** শিল্পরীতির প্রবর্তন হয়েছিল। সেই শিল্পধারাই চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়েই মথুরা শিল্পরীতিতে সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পরীতির প্রকাশ দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের যুগ হচ্ছে গুপ্ত রাজবংশের কাল। এ শিল্পরীতি একান্তই ভারতীয়। গুপ্তযুগেই অজন্তার গুহাচিত্র দেওয়ালে অঙ্কিত হয়েছিল।

ভাষা ও সাহিত্যঃ আধুনিক ভারতের প্রায় সব ভাষারই উৎস প্রাচীন ভারতীয় ভাষা। সংস্কৃতের প্রাচীনতম সাহিত্য **বেদ,**

ব্রাহ্মণ এবং **উপনিষদ**। এগুলি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তখনকার আর একটি ভাষা ছিল **প্রাকৃত**। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের এবং মৌর্য যুগের শাসনেরও ভাষা ছিল প্রাকৃত।

মৌর্য যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে **ব্রাহ্মী** লিপি। ব্রাহ্মী লিপি থেকেই পরের যুগের সব ভারতীয় লিপি সৃষ্ট হয়েছে।



ব্রাহ্মী লিপি

রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এগুলির মার্জিত রূপ দেওয়া হয় গুপ্তযুগে। এ যুগের সব সাহিত্যই সংস্কৃতে রচিত।

দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত নাটক রচিত হয়। বিশাখদত্তের মৃচ্ছকটিক, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ভাস এবং কালিদাসের সমস্ত নাটক গুপ্তযুগের। ভারতের শ্রেষ্ঠকবি কালিদাসের অপূর্ব কাব্য, নাটক—ভারতের গৌরব। ভারতের রচিত পশুপক্ষীর কাহিনী পরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। **পঞ্চতন্ত্র** প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে তামিল **সঙ্গম** সাহিত্যেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল।

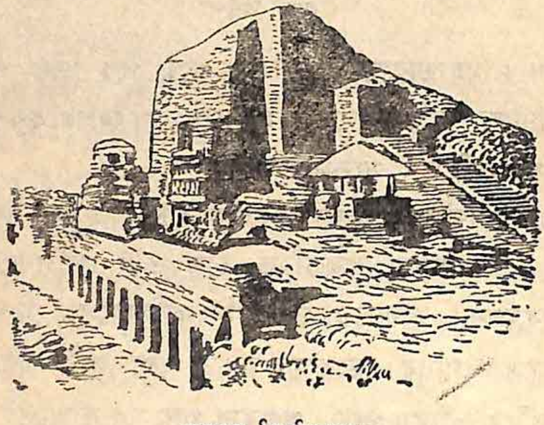
শিক্ষাঃ ভারতের শাসকগণ চিরকালই শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী ছিলেন। মৌর্যপূর্ব যুগে পশ্চিম ভারতের তক্ষশীলা ছিল বিশ্ব-বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। এখান থেকেই আয়ুর্বেদাচার্য জীবক চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

তারপর গুপ্তযুগে সারনাথ, বারানসীতে বৌদ্ধ বিহারে শিক্ষা-

কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গুপ্ত রাজবংশের রাজধানী পাটলিপুত্রের কাছে নালন্দা বিহার অতিদ্রুত বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র রূপে খ্যাতিলাভ করেছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য গুপ্ত রাজগণ অনেকগুলি গ্রামের উপসত্ব দান করেছিলেন।

বিজ্ঞানচর্চা ও জ্যোতির্বিদ্যাঃ প্রাচীনকালে ভারতের বিজ্ঞানচর্চা ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও ব্যাকরণ বিষয়ে বিভিন্ন **শাস্ত্র** রচিত হয়েছিল। এসব শাস্ত্র রচনার উদ্দেশ্য ছিল যাগযজ্ঞ ও ধর্ম অনুষ্ঠানের কাজে সাহায্য করা।

বৈদিক সাহিত্যেই ভারতের **জ্যোতির্বিদ্যার** উল্লেখ পাওয়া যায়। পূজা-অর্চনা ও যাগযজ্ঞের জন্য শুভদিন গণনার প্রয়োজন থেকে



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। এর পরের হাজার বছরের মধ্যে এ বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়েছিল। তখন গ্রহণের পূর্বাভাস ও রাশিচক্রের জ্ঞানও হয়েছিল।

গণিতঃ বৈদিক সাহিত্যে **গণিতেরও** উল্লেখ আছে। বৈদিক যাগযজ্ঞের বেদী নির্মাণের প্রয়োজন থেকে **জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির** উদ্ভব হয়। পরে গণিতের আরও অনেক বিকাশ হয়েছিল। ভারতেই প্রথম ১ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনা ও শূন্যের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল।

দশমিক গণিতেরও প্রচার এখান থেকেই হয়। গণিতের তখন দুইটি বিভাগ সৃষ্টি হয়—**পাটীগণিত** ও **বীজগণিত**। জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের অবিস্মরণীয় নাম **আর্যভট্ট, বরাহমিহির** এবং শূন্য আবিষ্কারকর্তা **ব্রহ্মগুপ্তের**। আর্যভট্টই পৃথিবীতে প্রথম বললেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

রসায়ন ঃ ভারতে **রসায়ন** শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হয় নানা শিল্পের প্রয়োজনে। বিশেষত চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প ও সিমেণ্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করতে রসায়নশাস্ত্রের নানা অগ্রগতি ঘটেছিল। সেকালে নাগার্জুন ছিলেন শ্রেষ্ঠ রসায়নশাস্ত্রবিদ। ধাতুবিদ্যাতেও রসায়নের সাহায্য প্রয়োজন হয়। ভারতীয়রা অতি উৎকৃষ্ট মানের ইস্পাত নির্মাণ করতেন। তার প্রমাণ দিল্লীর কাছের লৌহস্তম্ভ—যাতে আজও মরিচা পড়েনি।

চিকিৎসাবিদ্যা ঃ চিকিৎসাবিদ্যার সূত্রপাত হয়েছিল পশুবলি থেকে। তাদের শরীরের গঠন দেখে অস্থিবিদ্যার বিকাশ হয়। অথর্ববেদে অনেক রোগ ও তার চিকিৎসার কথা আছে। ভারতে গুপ্তযুগে মোমের দেহে ছাত্রদের অস্থিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। অতি প্রাচীনকালেও ভারতে মস্তিষ্কে শল্যচিকিৎসার কাহিনী পাওয়া যায়। চিকিৎসা বিভাগে শ্রেষ্ঠ হলেন জীবক, চরক ও শুশ্রূত। ভারতের চিকিৎসাবিদ্যা **আয়ুর্বেদ** বলে পরিচিত।

শাসনব্যবস্থা, কি অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান—প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। ভারতীয়রা নানা বিদ্যা বিদেশী গ্রীকদের কাছে থেকে শিখেছেন। আবার অন্যদেশের লোকও ভারতের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে নিজেদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

অনুশীলনী

প্রবন্ধধরনের প্রশ্ন :

১। চতুর্বেদ থেকে আর্যদের সমাজ জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখ। সে সমাজে মেয়েদের মর্যাদা কেমন ছিল? (২) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল কেন? বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষাগুলির পরিচয় দাও। (৩) ভারতের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট কে? কোন্ বিদেশী শক্তির সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল? সে যুদ্ধের ফলাফল কি? (৪) সম্রাট অশোককে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন? (৫) কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? তাঁর সময়ে বৌদ্ধধর্মের কি রূপান্তর ঘটেছিল? তাঁর সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল? তাঁর শাসনকালে ভারতের সংস্কৃতি মধ্য এশিয়ার কোন্ অঞ্চলে প্রচারিত হয়? (৬) প্রাচীন সাহিত্য ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে প্রাচীন বাঙলার পরিচয় দাও। (৭) মেগাস্থিনিস কার রাজত্বকালে ভারতে আসেন? তাঁর বিবরণীতে সে সময়ের ভারতের সমাজের কি পরিচয় পাওয়া যায়? (৮) ফা-হিয়েনের সময়ের ভারত কেমন ছিল? (৯) প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি বিষয়ে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ রচনা কর।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। প্রাচীন আর্যদের ইতিহাস আমরা কি থেকে জানতে পারি? (২) কুষাণ যুগে যে শিল্পকলার উদ্ভব হয় তার নাম কি? (৩) কণিষ্কের রাজসভার দুই-একজন মনীষীর নাম কর। (৪) গণিতে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান কি? (৫) শূন্য আবিষ্কারকর্তা কে? ৬। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে? ৭। ব্রাহ্মীলিপি কি?

বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন : [হ্যাঁ কি না '√' কিংবা '×' চিহ্ন দিয়ে দেখাও]

১। বিম্বিসার মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন———

২। গুপ্তযুগে বাঙলা দেশের সর্বত্র গুপ্তবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল——

৩। মেগাস্থিনিস আলেকজাণ্ডারের দূত ছিলেন———

৪। চরক, শুশ্রুত, জীবক ছিলেন বিখ্যাত কবি———

৫। চিকিৎসা বিদ্যার সূত্রপাত হয়েছিল পশুবলি থেকে———

৬। তক্ষশীলা ছিল বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র———